প্রেম নয়, মিছে কথা

মনোজ বসু

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স ॥ কলকাতা বারো

রচনাকাল। ১৯৬০
প্রথম প্রকাশ। অগস্ট, ১৯৬১

প্রকাশক: নির্মলেন্দু ভদ্র

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স
এ/৯, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-১২
মুদ্রাকর। অমলেন্দু ভদ্র
মুদ্রণ ভারতী
১৬/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা ১২
প্রচ্ছদ ব্লক। ব্লকম্যান প্রসেস
প্রচ্ছদপট মুদ্রণ। নিউ প্রাইমা প্রেস
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ রূপায়ণ। পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

॥ এক ॥

নামলেন চারজন এঁরা—শিল্পী মণিলাল দত্ত, শ্রীমতী দত্ত এবং নাতি-নাতনি রাহুল ও নীপা। সকাল সাতটা-দশ। উঁহু, কালেকটরির ঘড়িতে সাতটা-চল্লিশ। গিন্নি কিছু অবাক হলেন। খুরশিদ বুঝতে পেরেছে। বলে, বুঝলেন না চাচি? বাংলাদেশের ঘড়ি আধ ঘণ্টা আগে আগে চলে।

খিল খিল করে হেসে উঠল: তার মানে আমাদের বারোটা বেজে যাবে ভারতের আধ ঘণ্টা আগে।

বাসে এই খুরশিদ ছেলেটির সঙ্গে আলাপ। এবং দেখতে দেখতে জমে গিয়েছে। কলকাতা গিয়েছিল সে বিশ বছর পরে, এঁরাও যেমন কলকাতা থেকে বাড়ি দেখতে যাচ্ছেন। পার্কসার্কাস ইস্কুলে পড়ত খুরশিদ তারক দত্ত রোডের বাসায় থেকে, বাংলা ভাগ হয়ে গেলে যশোর চলে যায়। মোটে পঁচাত্তর মাইল। কত দূর-দূরান্তর গিয়েছে, তবু কুড়ি-কুড়িটা বছরের মধ্যে কলকাতায় গিয়ে একটি বার চোখের দেখা দেখতে পারেনি। এঁদেরও ঠিক তাই—এত কাছের বাড়ি, কিন্তু পথ আটকে দিয়েছিল। বাংলাদেশ এবারে মুক্তি পেয়ে গেছে—স্বাধীন সেকুলার দেশ। সাধ মিটিয়ে এপারে-ওপারে পুরোনো সম্পর্ক ঝালিয়ে নিচ্ছে। খুরশিদ বলছিল, তারক দত্ত রোডের পুরানো বাসাবাড়ির সামনে দিয়ে এই ক'দিনে কতবার যে পাকচক্কোর মেরেছি লেখাজোখা নেই।

এঁরা যাবেন মুলটি ও নন্দনপুর—গিন্নির বাপের ভিটা ও শ্বশুরের ভিটা এই দুই গ্রামে। খুরশিদের বাড়িও কাছাকাছি—রাজগঞ্জে। আরও এক পরিচয় বেরিয়ে গেল। খুরশিদের বাপ সেকেন্দার আলি ছিলেন জেলা-ইনস্পেক্টর। আজকের বিখ্যাত শিল্পী মণিলাল তখন মুলটি ইস্কুলের এক নগণ্য মাস্টার। অদ্ভুত তাঁর ছবির হাত, বিশেষত চটপট স্কেচ আঁকানোয় জুড়ি মিলত না। উঁচু দরের প্রতিভা না হলে বিনা শিক্ষায় এমনটি সম্ভবে না। মুলটি ইস্কুলের নানা রকম গলদ শুনে ইনস্পেক্টর সাহেব তদারকে এসেছেন। নিজে এই তল্লাটের মানুষ বলে ইস্কুল নিয়ে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন তখন। কাজে ব্যস্ত আলি সাহেব, মণিলাল কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁর ছবি বানিয়ে হাতে এনে দিলেন। তিনি তো স্তম্ভিত—এমন রত্ন এই জঘন্য জঙ্গুলে জায়গায়! জেলার সাহেব-ম্যাজিস্ট্রেট খুব শিল্পোৎসাহী, তাঁর কাছে সেকেন্দার আলি মণিলালের কথা বললেন, সদরে নিয়ে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর আঙুল ফুলে, কলাগাছ বললে হবে না, শালগাছ হয়ে গেছে। দেশের বাঘা বাঘা শিল্পীদের সঙ্গে লোকে এক নিশ্বাসে মণিলাল দত্তের নাম করে।

যাক গে, সে তো ভিন্ন কাহিনী। জানা গেল, আলি সাহেব বেঁচে আছেন এখনো, রাজগঞ্জেই আছেন। তাঁরই ছোট ছেলে খুরশিদ।

মণিলাল খুশি হয়ে বললেন, ভাল আছেন তিনি? পুণ্যাত্মা মানুষ—থাকবেনই তো! আমার যত-কিছু, তিনিই তার মূলে। তাঁকে আমার সালাম জানিও বাবা।

খুরশিদ বলে, ভাবনা নেই চাচা। মুলাটি অবধি আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি। মুলাটি আগে পড়বে, আজকের রাত সেখানে থেকে কাল নন্দনপুর যাবেন। হেঁটেই যাবেন, চাচির জন্যে শুধু পালকি—

গিন্নি বলে উঠলেন, আমিও হাঁটব।

রাহুল-নীপা হেসেই খুন: দিদা কি বলে শোন! হেঁটে যাবে নাকি এ-গ্রাম থেকে সে-গ্রাম।

গিন্নি চটেছেন এবার। বললেন, তোরা কি জানিস। মুলাটি আর নন্দনপুর মাঠের এপার আর ওপার। পথটুকু আমি হাঁটিনি কখনো, দৌড়েছি।

এই সদর থেকে গ্রাম দুটো বারো-তেরো মাইল। খুরশিদ ঘোড়ার-গাড়ি ভাড়া করল। মণিলাল তো অবাক: যাবে ঘোড়ার গাড়ি? সে আমলে গরুর-গাড়ি যেতেই তো গা-গতর ব্যথা হয়ে যেত। এই উঁচুতে উঠছে, খানার মধ্যে এই আবার হুড়ুম করে পড়ে গেল।

খুরশিদ বলে, পিচের রাস্তা—ঘোড়ার-গাড়ি কি বলেন, মোটর থাকলে হুস করে লহমায় পেঁছে দিয়ে আসত। কিন্তু মোটর-গাড়ি সব লুঠপাট করে নিয়ে গেছে, নয়তো পুড়িয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে।

আবার বলল, পাকিস্তানি আমলে আর কিছু না হোক, রাস্তাঘাট বানিয়েছে খুব। বিশেষ করে বর্ডারের কাছাকাছি এই সব এলাকায়। রাস্তা ভাল না হলে সৈন্য চলাচলে অসুবিধে যে।

চেনাই যায় না পুরানো সেই মুলাটি গ্রাম। দোতলা ইস্কুলবাড়ি ঝকঝক করছে, মণিলাল কিছুকাল যেখানে মাস্টারি করেছিলেন। গিন্নির বাপের-বাড়ি—ঘোষবাড়ির কিন্তু চিহ্নমাত্র নেই। দালানের ভিত খুঁড়ে মাটির তলের ইঁট অবধি বিক্রি করে দিয়েছে। বাপ মধুসূদন ঘোষ, বাগবাগিচার বড্ড শখ ছিল তাঁর। কাঁহা-কাঁহা মুলুক থেকে কলমের চারা এনে পুঁতেছিলেন—আম ছাড়াও গোলাপজাম, জামরুল, সপেটা, লিচু, এমন কি তেজপাতার গাছ অবধি। মালিক নেই—ফলফুলুরি খা না রে বাপু, তা নয়, গাছ কেটে কেটে উনুনে পুড়িয়েছে। অত বড় বাগিচায় একটা গাছ নেই—ফাঁকা মাঠ, আউশধানের ক্ষেত। কি ভাগ্য, বুড়ো নারকেলগাছ একটা রয়ে গেছে—তাই থেকে অন্দরবাড়ির পাঁচিলের হদিস পাওয়া গেল। নারকেলগাছ বাদ দিয়ে পাঁচিল ঐ জায়গা থেকে বেঁকে গিয়েছিল।

খাতা-পেন্সিল হাতে, মণিলাল এদিক সেদিক বেড়াচ্ছেন, রাহুল তাঁর সঙ্গে। আর গিন্নি নীপাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন : গোলা ছিল নারকেল-গাছ ঘেঁষে, গোলার পাশে আমার বিয়ের ছাতনাতলা হয়েছিল—এইখানটা আন্দাজ হচ্ছে। চার কোণে চার কলার বোগ—মাঝখানটায় চিত্তির-করা জল-চৌকির উপর তোর দাদু দাঁড়িয়ে। ঢোল-কাঁসি-শানাই মানুষজনে চারিদিক গমগম করছে। কনে-পিঁড়িতে আমি ঘাড় গুঁজে চোখ বুঁজে রয়েছি, সাতপাক ঘোরাচ্ছে আমায়—

নীপা বলল, তোমাদের তো প্রেমের বিয়ে দিদা। চোখ বুঁজতে গেলে কেন?

প্রেম-ট্রেম ছিল না রে আমাদের আমলে। ঝগড়ার বিয়ে, মারামারির বিয়ে। মেরে কতদিন ভূত ভাগিয়েছি—বিয়ের সময় তবু ভিজে-বেরালটি। নয়তো সবাই বলাবলি করত, ওমা, দেখ, বিয়ের কনে পিটপিট করে তাকাচ্ছে। নিন্দে রটে যেত।

মোটা মানুষ এইটুকু ঘুরেই নারকেলগাছের গোড়ায় ধপ করে বসে পড়লেন। চোখ বুঁজেছেন।

খুরশিদ ছিল না, সর্দারপাড়ায় আত্মীয়-বাড়ি গিয়েছিল। সে ও-বাড়ির আরশাদকে নিয়ে ফিরে এল। বলে, চাচির যে বসে বসেই একঘুম হয়ে গেল —হি-হি-হি। এদের বাড়ি চলুন সব। টিউবওয়েল আছে—হাত-পা ধুয়ে নাস্তা খেয়ে নিইগে।

কলকাতার মানুষ এসেছে, চাউর হয়ে গেছে। ভিড় বেশ, নিরন্নই প্রায় সব। ভুঁয়ের ফসল ঘরে তুলতে পারেনি, জঙ্গীরা পঙ্গপালের মতন পড়ে শেষ করে দিয়েছে। রোগা-ডিগডিগে কয়েকটা ছোঁড়া ডাংগুলি খেলছে—হঠাৎ বলে উঠল, খোঁড়া ন্যাং ন্যাং ন্যাং—

গিন্নিকে উদ্দেশ করে। মোটা মানুষ, তায় বাতের দোষ। হাঁটছেন, আর সেকালের মধ্যে মশগুল হয়ে আছেন একেবারে। খেয়াল করেননি, সত্যিই বড্ড খোঁড়াচ্ছেন তিনি। বেঢপ মোটা বলে উৎকট দেখাচ্ছে। ছোঁড়াগুলো দূর থেকে ছড়া কাটছে, আর হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

তাকিয়ে দেখে গিন্নিও হাসছেন। নীপাকে বললেন, বিয়ের রাত্রে বাসরঘরে তোর দাদু প্রথম আমায় কি বলেছিল জানিস?

বলো না, বলো না—বলে নীপা জড়িয়ে ধরল।

খোঁড়া ন্যাং ন্যাং ন্যাং—ঐ ছড়াই।

খুরশিদ বিষম চটেছে, আরশাদকে চোখ টিপে দিল। ধরবার জন্য আরশাদ ছুটল, ছোঁড়ারা পালাচ্ছে। একটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টুঁটি চেপে টানতে টানতে নিয়ে এল।

খুরশিদ গর্জন করে উঠল : নচ্ছার বেয়াদব শয়তান—

ঠাঁই-ঠাঁই করে গালে চড়। গিন্নি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন : ছেলেমানুষ এরা কী বোঝে? বড় হলে চেপেচুপে থাকত, মনে মনে হাসত। বড়য়-ছোটয় এই তো তফাত।

নিজেই এগিয়ে এসে ছেলেটাকে মুক্ত করে দিলেন। বলেন, খোঁড়াচ্ছি দেখে মজা লাগছে—না? খোঁড়া ন্যাং ন্যাং ন্যাং—তারপরে কী, বলতে পারিস?

পারলেও ছেলেটা বলছে কিনা আর! প্রাণ উড়ে গেছে তার ভয়ে।

হেসে উঠে গিন্নি বললেন, পারলি নে তো? কার দুয়োরে গিয়েছিলি, কে ভেঙেছে ঠ্যাং? কত আমরা ছড়া কাটতাম আমার এই বাপের-বাড়ির গাঁয়ে!

পাঁচ টাকার একটা নোট তার মুঠোয় গুঁজে দিলেন : বাজারখোলায় মিঠাই-এর দোকান দেখে এলাম—সবাই তোরা মিষ্টি কিনে খা গিয়ে।

॥ দুই ॥

পিছনের কথায় যাই চলুন। সেকালে এই গাঁয়ের একজন ছিলেন মধুসূদন ঘোষ। গালভরা নামের ঝোঁক তাঁর। বলতেন, বড় নামে যখন বেশি ট্যাকসো নেই, ওতে কৃপণতা করব কেন? ছেলের নাম রাখলেন রত্নেশ্বর, মেয়ের নাম ইন্দুলেখা। শেষ বয়সে আবার যে ছেলে হলো তার নাম রুদ্রেশ্বর। কিন্তু কোন নাম টেকেনি। ছেলে দুটো কালু-ভুলু—আর মেয়েটা—স্থূলবপু এই যে গিন্নিঠাকরুন এসেছেন—পাটকাঠির মতন লিকলিকে ছিলেন ইনি, বাতাসের আগে ছুটতেন। পিসি তাই ছটাকি ছটাকি করতেন, ওজনে কয়েক ছটাক নাকি। পিসির সেই নামই মুখে মুখে চলল।

মেয়ে কিছু বড় বলে মধুসূদনের স্ত্রী রাধিকা ননদের কাছে দরবার করতেন। নামটা কেমনধারা যেন হলো ঠাকুরঝি! বিয়ে-থাওয়া হবে, কনে দেখতে এসে শুনবে—ছটাকি। নাম শুনেই তারা মুখ বাঁকাবে।

পিসির সাফ জবাব : বলতে গেলে দাঁত ভাঙে, লিখতে গেলে কলম ভাঙে, ও-সব নাম চলবে না। ছটাকিই তো ভাল।

বালবিধবা হয়ে চিরকাল তিনি বাপের সংসারে এবং পরবর্তীকালে ভাইয়ের সংসারে। প্রচণ্ড দাবরাব। নাম কৃষ্ণভাবিনী—হালের ছোঁড়াছুঁড়িরা ঘুরিয়ে কৃষ্ণবাঘিনী বলে। হতে হতে শুধু বাঘিনী। লুকিয়ে-চুরিয়ে বলে অবশ্য, কার ঘাড়ের উপর ক'টা মাথা আছে সামনাসামনি বলতে যাবে!

নিরুপায় রাধিকা কি করেন—পিসির নামই কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত ও মোলায়েম করে নিলেন—ছটাকি করে নিলেন ছটা।

ছটার বারো-তেরো বছর বয়স, সেই সময়ে ছেলে রত্নেশ্বর অর্থাৎ কালু হঠাৎ মারা গেল। মধুসূদন বাড়ি না, সুন্দরবনের দূর জঙ্গলে নোনাপানি খেয়ে পড়ে থাকেন। ফরেস্টারের চাকরি। সুন্দরবন সে আমলে কুবেরের ভাণ্ডার। মধু, সুঁদুরি ও গরান কাঠ, হরিণের চামড়া, ঘর-ছাওয়ার গোলপাতা ইত্যাদি ইত্যাদি এবং উপরি পাওনার লেখাজোখা নেই। সরকার যদি বলতেন মাইনে একপয়সাও দেবো না, উল্টে চাকরি বজায় রাখার জন্য বার্ষিক সেলামি দিতে হবে, তবু ফরেস্টারের অভাব হতো না। এহেন চাকরি মধুসূদনের।

প্রথম অপত্যশোক রাধিকার বড্ড লেগেছে। দিন-রাত্রি কাঁদেন, ক্ষণে ক্ষণে ফিট হয়ে পড়েন। জলের কলসি নিয়ে ভিজে কাপড় সপসপ করতে করতে একদিন পুকুরঘাট থেকে ফিরছেন, ধপ করে পড়ে গেলেন। চৈত্র মাস, কড়া রোদে আমের গুটি ঝরে পড়ে, ছটাকি তলায় তলায় ঘুরছিল। আর্তনাদ করে

উঠল সে। মানুষজন ছুটে এল। উঠোনের হুড়কোর ধারে রাধিকা অজ্ঞান হয়ে আছেন, জলের কলসি ভেঙে শতখান হয়েছে।

জল ঢালছে কেউ মাথায়, কেউ বা বাতাস করছে। করতে করতে সাড় এল। বউ, ও বউ—ঝুঁকে পড়ে ভাবিনী ডাকছেন। রোদ এসে মুখে পড়েছে। রাধিকা বিড়বিড় করে কি বলেন, আর আকাশে হাতছানি দেন। কি বলেন, শোন তো স্থির হয়ে কান পেতে। বলছেন, নেই—নেই।

সর্বনাশ, মাথা খারাপের লক্ষণ যে!

মধুসূদনের কাছে খবর গেল। বনকরের কাজে ছুটিছাটা বড় কম। দায় জানিয়ে বিস্তর লেখালেখির পর অবশেষে এক হপ্তার ছুটি মঞ্জুর হয়ে এল। সাত দিনের ভিতর আসতে যেতে আড়াই আর আড়াই এই পাঁচটা দিন তো পথেই কেটে যাচ্ছে। সন্তান-শোকের চেয়েও স্ত্রীর অবস্থা দেখে অধিক বিচলিত হলেন মধুসূদন। উপায় কি এখন?

মুরুব্বিরা একবাক্যে বলেন, নিজের কাছে রাখো গে কিছুদিন। চৈত্র মাসের আকাশে আগুন, বুকের মধ্যেও আগুন জ্বলছে। জঙ্গলের ঠান্ডারাজ্যে গেলে খানিক-খানিক জুড়িয়ে যাবে। এখনকার দিনে বাদা আর ভয়ের জায়গা নেই। ঐ তো সাতাশকাঠির রামশরণ হালদার বাড়িসুদ্ধ ঝেঁটিয়ে বাদায় নিয়ে তুলেছেন।

প্রবীণ নীলকণ্ঠ কবিরাজও চোখ টিপে ঐ ব্যবস্থা দিলেন: দেবী এক মুলুকে, দেবা আর মুলুকে—বারো মাস তিরিশ দিন। ভাল মাথাই বিগড়ে যায়, বউমা তো শোকে-তাপে জ্বলছেন। অষুধপত্তোরে ঘোড়ার-ডিম হবে—কাছে নিয়ে রাখো গে, দু' দিনে সামলে উঠবেন।

হক কথা। কিন্তু যাবতীয় লটবহর গুছিয়ে সঙ্গে নিয়ে অজঙ্গি জঙ্গলে ঢোকা চাট্টিখানি কথা নয়, দুটো দিনের মধ্যে সে জিনিস হয় না। কোয়ার্টার বলে ঘর একটা আছে বটে, রান্নাঘর-উঠোনও আছে—কিন্তু একলা মানুষ বলে মধুসূদন শোওয়া-বসা-খাওয়া সমস্ত অফিসঘরে সারেন। রান্নাবান্নার জন্য যতীন নামে এক ছোঁড়া আছে, রাত্রে কাঠের মেজের উপর দু'জনে কাছাকাছি শয্যা পেতে নেন। কোয়ার্টার তাই আঁস্তাকুড় হয়ে আছে, উঠোনে ও মাটির রান্নাঘরে ঘোর জঙ্গল। সাফ-সাফাই করতে সময় লাগবে। সমস্ত সমাধা করে—নিজে আর আসতে পারবেন না, হেডগার্ড সাতকড়িকে পাঠাবেন। সে এসে ব্যবস্থা করে নিয়ে যাবে।

ভাবিনীকে মধুসূদন বললেন, তুমিও চলো দিদি। কাজকর্মে অনেক সময় আমার বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়। তুমি বাসার উপর থাকলে নিশ্চিন্ত।

ভাবিনী ঘাড় নাড়েন: এ-বাড়িও যে তাহলে আর এক বাদাবন হয়ে যাবে।

সৈরভী নামে মাহিষ্যপাড়ার এক মেয়েকে বরে নেয় না, রাধিকা এনে এ-বাড়ি রেখেছেন। মাসে মাসে দেনও কিছু কিছু। আমি যাবো, আমি যাবো—করে সে

নাচন জুড়ে দেয়।

মধুসূদন আপত্তি করেন : উঁহু, দিদি রয়ে যাচ্ছেন। একলা উনি কেমন করে থাকবেন?

সৈরভী বলে, আমি থেকে কি করব? সকলে চারিচরণে রয়েছেন, তাই বা আমি ক'টা কাজ করতে পাই। পিসিঠাকরুন একাই সব করবেন। তাতেও সুখ হয় না—এ-বাড়ি ও-বাড়ি গিয়ে কাজ করে দিয়ে আসেন। এখনই এই, আর কেউ যখন থাকবেন না—ওরে বাবা! হাত-পা বেঁধে পিসিঠাকরুন পিঁড়ি পেতে আমায় বসিয়ে রাখবেন।

মধুসূদন হেসে বললেন, তা থাকিস তুই পিঁড়িতে বসে। আমি ঠিক ঠিক মাইনে দিয়ে যাবো।

হাতে পায়ে আমার বাত ধরে যাবে বাবু। কাজ করব না, মাইনেই বা কেন নিতে যাব?

মধুসূদন বলেন, কাজ মোটে করবিনে, সে তো নয়। ঝগড়া করবি দিদির সঙ্গে।

সৈরভী বলল, আমি ঝগড়া পারিনে।

তা বটে, তা বটে। মধুসূদন প্রণিধান করলেন : তল্লাটের মধ্যে কে-ই বা পারে দিদির সঙ্গে? কিন্তু একজনে যে ঝগড়া হয় না—তুই হাজির থাকলেই হবে, তোকে সামনে রেখে একাই দিদি চালিয়ে যাবেন।

সৈরভী বলে, ঠিক কথা বলেছেন। একলা ঝগড়া হয় না—কেউ না থাকলে সারা দিন খেটেখুটে রাতটুকু ভাবিনী পিসি নির্ঝঞ্ঝাটে ঘুমিয়ে নিতে পারবেন।

প্রতিবেশী শশধর কথার মাঝে এসে পড়লেন : বলছে কি সৈরভী?

মধুসূদন বলেন, সৈরভীও বাদায় যাবে বলছে। মানুষ না থাকলে দিদি নাকি খুব ভাল থাকবেন, রাত্রে চুপচাপ ঘুমোবেন।

শশধর উঁহু উঁহু করে উঠলেন : অমন কাজও করিসনে সৈরভী। দিদির জন্যে না হোক, আমাদের জন্য, পাড়ার ইতরভদ্র সকলের জন্য থাকতে হবে তোকে। ঝগড়াঝাঁটি বন্ধ করে দিদি চুপচাপ হয়ে যাবেন—সর্বনেশে কাণ্ড! রাত দুপুরে ধুন্দুমার—আমরা তার মধ্যে আরাম করে ঘুমোই। চোর-ছ্যাঁচোড় পাড়ার ত্রি-সীমানায় ঢোকে না—টাকাপয়সা উঠোনে মেলে দিয়ে রাখলেও কোন বেটা ছুঁতে আসবে না।

সৈরভী অনুকল্প হিসাবে তার বুড়োথুথুড়ে মাকে এনে দিল। ঝগড়ায় প্রতিপক্ষ অতিঅবশ্য চাই, কিন্তু সেজন যত বড় খাণ্ডারনীই হোক, বাঘিনী ঠাকরুনের মুখের সামনে নির্বাক পুতুল মাত্র। অতএব বুড়ো মায়ে অসুবিধা নেই। জলজ্যান্ত মানুষই বা কেন, একটা বাঁশের লাঠি দাঁড় করিয়ে রাখলেও তো কাজ চলা উচিত।

মধুসূদন এই এসে গেলেন, আবার এখন কিছুতে মোকাম ছাড়তে দেবে না। মরে গেলেও না। হেডগার্ড সাতকড়িকে পাঠালেন। সাতকড়ির বাড়ি এই মুলুটিতেই—পশ্চিমপাড়ায়। মধুসূদনকে ধরেছিল, চেষ্টাচরিত্র করে তিনি বনকরের কাজে ঢুকিয়ে নিলেন। লেখাপড়া কিছু কম জানার দরুন গার্ড হয়ে ঢুকতে হলো। কয়েকটা দিন ছুটি নিয়ে সাতকড়ি বাড়ি এসেছে, তার সঙ্গে এঁরা সব যাচ্ছেন—রাধিকা, ছটা ও নাছোড়বান্দা সৈরভী।

॥ তিন ॥

শেষরাত্রি। আকাশে তারা দপ-দপ করছে। গরুর-গাড়িতে ওঠার সময় রাধিকা আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছেন। ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজের মধ্যে গ্রামপথে এক-সময় অবশেষে কান্না মিলাল, চোখের জল মুছে রাধিকা শান্ত হলেন। ছুটা ভ্যানর-ভ্যানর করছে—কথার একটা দুটো জবাব দিতে হচ্ছে। তার এই প্রথম দূরদেশে যাওয়া—নদী দেখবে, নৌকো দেখবে। নৌকোর উপর ভেসে ভেসে যাবে। দিন কেটে যাবে নদীর উপর, রাত্রি আসবে। রাত্রিও কেটে যাবে।

রাধিকা বলছেন, রাত আছে খুকি, একটু শুয়ে নে। অত কি দেখছিস এক নজরে?

দেখছে, নতুন আর কি—ঘরবাড়ি গাছপালা মাঠঘাট। শেষরাত্রের পাতলা অন্ধকার মুড়ি দিয়ে বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে সব। গরুর-গাড়ি ঢিকির-ঢিকির করে যাচ্ছে—গরু ঠিক ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটছে। গাড়োয়ানও জেগে নেই—নইলে এক-আধবার কি হেই-হুই করত না? কতদূর আর কাটাখালির ঘাট, গাড়ি যত এগোচ্ছে, কাটাখালি তার নদীটা নিয়ে তত যেন পিছিয়ে পড়ছে। আধেক-আঁধারে খেলা চলছে যেন গাড়িতে আর গাঙে। এ ধরতে যাচ্ছে, পালাচ্ছেও ততই।

রাত পোহাল অবশেষে। দিব্যি ফরসা। গাছে গাছে পাখি ডাকছে। মানুষও জেগেছে, ঘর-কানাচে গাড়ি গিয়ে পড়লে শব্দসাড়া পাওয়া যায়। সামনে তাকায় ছুটা, গরু দুটো ঢিগ ঢিগ করে চলেছে তো চলেইছে। ডাইনে তাকায়, সাতকড়ি-জেঠারও ঠিক গরুর মতন হাঁটনা। রাস্তা ছেড়ে হঠাৎ গাড়ি হুড়মুড় করে পাতালমুখো ছুটল। এসে গেছে কাটাখালি—নদীর খোলে নামছে।

শুকনোর সময় চড়া পড়ে গিয়ে জলধারা অতি সঙ্কীর্ণ। ছুটা মুষড়ে গেল: ধুস, এই তোমার নদী! এ তো লাফিয়ে পার হতে পারি।

রাধিকা হাসিমুখে বললেন, হনুমান সাগর লাফিয়ে পার হয়েছিলেন, আর আমার হনুমান-মেয়ে গাঙ লাফাবে—কত বড় কথা!

ছুটার মাথায় অন্য ভাবনা ঢুকে গেছে: গাঙ ধরে যদি এইদিকে যাই—

গরুর-গাড়ি ছেড়ে সকলে নেমে পড়েছেন। প্রসন্ন সকালটা রাধিকার বড় ভাল লাগছে। ছুটার সেই গাঙ ধরে চলে যাওয়া—বলছে, ধরো মা, যাচ্ছি আমি, কেবলই যাচ্ছি—

সৈরভী দুম করে বলে উঠল, যাও না, মানা করছে কে?

যেতে যেতে যেতে—তারপরে?

সৈরভী হাত দুলিয়ে বলে দেয় : তারপরেও যাও।

মাস ধরে গেলাম, বছর ধরে গেলাম, গাঙের শেষ মাথায় যখন পেঁৗছে গেছি—

সাতকড়ি বলে দিল, সাগর।

শোনা কথা নয়, বইয়ে পড়া নয়, বাদার মানুষ নিজের চোখ দুটো দিয়ে দেখেছে। বড় বড় ভয়াল নদীর উপর দিয়ে সাগরের একেবারে কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে কতবার।

সেই সাগরের কিছু কলাও বর্ণনা দিয়ে সাতকড়ি বাহাদুরি নেবে, ততক্ষণে ছটা মতি পরিবর্তন করে ফেলেছে। বলে, ওদিকে গেলাম না, যাচ্ছি এই উল্টো দিকে। দু-মাস, ছ-মাস—

রাধিকা থামিয়ে দিলেন : আর পারবি নে। পর্বত। চূড়া আকাশে ঠেকেছে। সেই আকাশ থেকে কলকল করে গাঙ নামছে।

ডিঙি ভাড়া করে সাতকড়ি কাটাখালির ঘাটে রেখে গেছে। জঙ্গলের কাছাকাছি গিয়ে বোটের ব্যবস্থা। মালপত্তোর ডিঙিতে তোলা হলো। সাতকড়ি ডাকছে : ওঠো তো এইবার। গোন লেগেছে, ছাড়বে।

জল থমথমা হয়ে ছিল, টান ধরেছে। আগনৌকোয় বসে গাঙের জলে খলবল করে ছটা পায়ের কাদা ধুয়ে নিল। করুণ কণ্ঠে বলে, আলতা ধুয়ে গেল—যাঃ। কেমন সুন্দর করে পটলিদি পরিয়ে দিয়েছিল।

ডিঙিতে ছই দিয়ে নিয়েছে—যে গরুর-গাড়িতে এল তারই মতন। দুটো লোক সামনাসামনি পা মেলে বসে তামাক খাচ্ছিল—হুঁকো রেখে ধাঁ করে ঘুরে দু-পাশের দাঁড়ে বসে গেল। কী মোক্ষম বাওয়া বাইছে কাঁ-কোঁ আওয়াজ তুলে। গাঙের জল উথাল-পাথাল। সাঁ-সাঁ করে ছুটছে ডিঙি। আর ওদিকে ঐ যে একটা লোক, যাকে মাঝি বলা হয়, লোকটার ভারি মজা!—নিষ্কর্মা বসে আছে। কদাচিৎ বা ঝপাঝপ কয়েকটা টান দিয়ে দিল। আবার চুপ।

কূল ঘেঁষে যাচ্ছে। ডাঙার পথ আর গাঙে যেন পাল্লাপাল্লি—পথেরও মুড়োদাঁড়া নেই। বড় বড় কয়েকটা তেঁতুলগাছ এল—তলার এদিকে সেদিকে চালাঘর হা-হা করছে মানুষজনের অভাবে। হাটখোলা—সাতকড়ি বলে দিল। হাটের সময় হলে দেখতে পেতে কী প্রচণ্ড ভিড়, কত কেনা-বেচা। এক ক্রোশ দূর থেকে আওয়াজ পেতে। আরও বেলা হলো, মানুষজন গরু-ছাগল নজরে পড়ছে। গাঙের উপর ঝুঁকে-পড়া নারকেলগাছে চড়ে এক ছোঁড়া কাঁদি কেটে দিল। জলে এসে পড়ল, জল ছিটকে গা ভিজিয়ে দিল ছটার। আর একটু হলে কাঁদিসুদ্ধ ঘাড়ের উপর পড়ত যে। সাঁকো একটা—নিচে দিয়ে যাবে, কিন্তু ছইয়ে আটকাচ্ছে। দাঁড় ছেড়ে উঠে দাঁড়ি একজন সাঁকোর বাঁশ উঁচু করে ধরল, সড়াক করে বেরিয়ে গেল ডিঙি।

ও সৈরভী, ও মা, খোপের মধ্যে কি তোমাদের? বাইরে এসে দেখ না—

ছটা উল্লাসে চেঁচাচ্ছে। পাড়ের পথ ধরে এক জোড়া পালকি যায়। বর-বউ। ভাল দেখতে পাবে বলে ছটা ছইয়ের উপর উঠে পড়ল। গোলপাতায় ছাওয়া ছই মচ মচ করে উঠল—ভেঙেচুরে না পড়ে। ছোট ছোট দুই পালকি কখনো আগুপিছু, কখনো বা পাশাপাশি যাচ্ছে। বর দেখা যায় পালকির দরজা দিয়ে—একেবারে একফোঁটা শিশু। ঢোল-কাঁসি নেই আর দশটা বিয়ের মতো—ঢোলক আর মন্দিরা। পালকি বইছে যেসব বেহারা, বাজাচ্ছে তাদের ভিতরের জনা কয়েক। গানও গাইছে তারা। ওদের মধ্যে ক'টা মেয়ে-বেহারা—ছটা ভেবেছিল তাই বটে—সাতকড়ি হেসে রহস্য ফাঁস করে দিল। মেয়ে ওদের একটাও নয়—শাড়ি ও পরচুলা পরে মেয়ে সেজেছে। পায়ে ঘুঙুর, গানের তালে তালে নাচছে তারা—কাঁধের পালকিও নাচের সঙ্গে দুলছে। ডিঙি থেকে এতগুলো লোক তাকিয়ে পড়েছে, এবং ছটা একেবারে ছইয়ের শীর্ষে—তাই দেখে বউয়ের পালকির দরজা ওদের একজনে খুলে দিল। আরে আরে, বউ দেখি আরও ছোট—আমাদের ছটার চেয়েও কমবয়সি।

সৈরভী বলে, ও মা, বাবুকে বলো না, ছটার বিয়েটা দিয়ে দিন।

যে-ই না বলা, হুড়ুম করে কি যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল সৈরভীর ঘাড়ে। চিল-শকুন নয়, ছইয়ের উপর থেকে ছটা লাফ দিয়েছে। কথা নেই বার্তা নেই, দমাদ্দম কিলোচ্ছে।

ঠেলেঠুলে কবলমুক্ত হয়ে সৈরভী বলে, মেয়ে একখানা তুমি বাবা! বাঘিনী ঠাকরুনের ভাইঝিই বটে। একটু এদিক-ওদিক হলে যে গাঙের গর্ভে চলে যেতে হতো।

গাঙ কিছু বড় হয়ে এখন ডিঙি মাঝ বরাবর চলছে। কত গাঁ-গ্রাম মাঠঘাট পার হয়ে এল। আম-কাঁঠাল নারকেল-সুপারির বাগান এপারে ওপারে। এক জায়গায় বেশ মজা—এপারে ঘরবাড়ি ও ঘাট, ওপারেও ঠিক তাই। বউ-ঝিরা ঘাটে নেমে চান করছে, কাপড় কাচছে, কলসি ভরে জল নিয়ে যাচ্ছে। এপারে-ওপারে গল্পগাছাও চলছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। তাতে জুত হলো না বুঝি—কলসি বুকের তলে দিয়ে সাঁতরে একটা মেয়ে এপারে চলে এল। এসে নিচুগলায় বলাবলি হচ্ছে। ডিঙি ছাড়িয়ে চলে এল, মেয়েটার চোখ ঘুরানো, তবু নজরে পাওয়া যায়, খিলখিল খুকখুক হাসি কানে আসে।

সাতকড়িকে ছটা বলে, এমনি গাঙের উপর বাড়ি হলে বেশ হয়। না জেঠা?

সাতকড়ি বলল, গাঙের উপরের বাড়িতেই যাচ্ছ তো এবার। এ আর কি—সে সব মস্ত মস্ত গাঙ।

কত বড়? দূরের বাবলাগাছটা দেখিয়ে বলল, অত দূর?

ওর দশগুণ বিশগুণ। গাঙ দেখে দেখে ঘেন্না ধরে যাবে মা-জননী। চোখ বুজে পড়বে, গাঙ যাতে না দেখতে হয়।

বাঁক ঘুরে গিয়ে গাঁ-গ্রাম অদৃশ্য। তলতাবাঁশ জলে ঝুঁকে পড়েছে, কঞ্চিতে

কঞ্চিতে নিম্নমুখ বাদুড়। অজস্র বাদুড়-ফল ফলেছে, হঠাৎ মনে হবে। উল্টো পারে বিল। বিল থেকে পাশখালি এসে পড়েছে। ঘাস বোঝাই তিনটে ডোঙা ধ্বজি মারতে মারতে সেই পথে গাঙে এনে ফেলল। মাঝির কি ভাবোদ্রেক ঘটল, গান ধরল সে হঠাৎ :

গুরু ভবপারের কান্ডারী।
গুরু কি পার করিতে পারে
হয় যদি তোর ছিদ্রতরী?
নবছিদ্র তরী 'পরে
জল ওঠে তার নবদ্বারে—
যাবি যদি ভবপারে
তরী ছাড় শীঘ্র করে।

মাঝিকে দেখিয়ে ছুটা বলল, মানুষটা গতরশোকা জেঠা। গান গায় ভাল, খাটতে পারে না। ও বাইলে নৌকো আরও কত জোরে চলত।

সাতকড়ি চোখ টিপে বলে, ছুটা-মা বলছে কাজ করো না তুমি মাঝি। চুপচাপ বসে থাকো, আর গান গাও।

মাঝি রাগের ভান করে বলে, চুপচাপই থাকি তবে। এমনিও বদনাম, অমনিও তাই।

জল থেকে হাল একটু তুলে ধরতেই ডিঙি পাক খেয়ে গেল। মাছ ধরার জন্য পাড়ের দিকে পাটা দিয়ে ঘিরেছে, তারই ভিতর সেঁধিয়ে পড়ে আর কি! ছুটা আঁতকে উঠল। হাসতে হাসতে মাঝি হাল বেয়ে ডিঙি ঘুরিয়ে যথাস্থানে আবার নিয়ে এল। বলে, দেখতে পেলে কাজ আমার?

হঠাৎ সাতকড়িকে উচ্চাঙ্গের ভাবে পেয়ে যায়—এক্ষুনি যে দেহতত্ত্ব শুনল, তারই ফল আর কি। বলে, ভগবানের কাজও এমনিধারা। হাল ধরে আছেন, ব্রহ্মাণ্ড ঠিকঠাক চলছে। মনে হবে, কিছু করেন না তিনি, ক্ষীরোদসাগরে পড়ে পড়ে ঘুম দিচ্ছেন।

ছইয়ের খোপ থেকে রাধিকা মেয়েকে ডাকাডাকি করছেন : ঠা-ঠা রোদ্দুরে কেন, ভিতরে চলে আয়।

তা বই কি! বাড়িতেও তুমি ঘরে আটকে ফেল, ছলে ছুতোয় বেরুতে হয়। এমন খোলা গাঙে খোপের ভিতরে ঢুকে জুজুবুড়ি হয়ে বসতে বয়ে গেছে। চেঁচাক গে মা, ছুটা কিছু শুনতে পাচ্ছে না।

মাঝিকে সাতকড়ি বলছে, বেলা মাথার উপরে। চাট্টি চিঁড়ে চিবিয়ে আছে সব। আর কতক্ষণ?

এতক্ষণে তো গিয়ে পড়বার কথা। মুখোড় বাতাসে দিক করছে বড্ড।

দাঁড়িদের উপর মাঝি হাঁক পাড়ল : টেনে চল ভাই। ভাঁটা থাকতে থাকতে ট্যাংরামারি পেঁছিতে হবে। বেগোন হলে বড় ভোগান্তি।

কষে দাঁড় টানছে। মাঝিও কড়া হাতে হাল বাইছে জলে আলোড়ন

তুলে। গাঙ বেশ বড় হয়ে গেছে এখন, হাঁক পেড়েও এপারে ওপারে কথাবার্তা চলাবে না।

ভ্যালা রে ভাইসব! পক্ষীরাজ উড়ে চলেছে।

স্ফূর্তি দিচ্ছে মাঝি। নিজ হাতের হালে হুড়ুম-হাড়াম আওয়াজ তুলে জল ভাঙছে। বাঁকখানা ঘুরে মুখোড় বাতাসও তেমন নেই। গাঙের স্রোত নাচাচ্ছে যেন ডিঙিখানা ধরে—ছোট্ট ছেলেটাকে হাতে তুলে যেমন নাচায়।

পাহাড় একটা। উঁহু, ঝুরি-নামা প্রকাণ্ড এক অশ্বত্থ—কাছে এসে বোঝা যায়। যাক, এসেছি তাহলে। দাঁড়ি-মাঝি সব সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে। জোয়ারের টান ধরে গেছে—আর দেরি হলে কাদা ভেঙে গুন-টানা ছাড়া উপায় ছিল না।

বড় নদীতে এসে মিশল এতক্ষণের সামান্য গাঙ। মোহানাটাকে ট্যাংরামারি বলে—অশ্বত্থগাছ নিশানা। অশ্বত্থতলা আবার তিন রাস্তার মুখ। খেয়াঘাট অদূরে, বিস্তর লোক পারাপার হয়। দোকানও আছে, চাল-ডাল, নুন-তেল, হাঁড়ি-মালসা মেলে।

॥ চার ॥

ট্যাংরামারি ডিঙি বাঁধল। অর্ধেক জোয়ারে ছাড়বে। জোয়ার শেষ করে ভাঁটা ধরবে আবার সজনেখালি গিয়ে। বোট অপেক্ষা করছে সেখানে--ডিঙি ছেড়ে সরকারি বোটে চাপবে।

রাঁধাবাড়া এই জায়গায়। চাল-ডাল, আনাজপত্র সঙ্গে আছে—তবু যেহেতু হাতের কাছে দোকান, ভাণ্ডার এখন খরচা করবে না, কেনাকাটা করে নেবে। অধিক কিছু নয়—চালে-ডালে খিচুড়ি এবং আলু-ভাতে। থালা আছে সঙ্গে, কিন্তু মাজা-ঘসার হাঙ্গামায় কে যায়? অদূরের জলায় পদ্মবন। ফুল বেশি নয়, পাতা ছত্রাকার হয়ে আছে।

এক দাঁড়ি গিয়ে পদ্মপাতা তুলে আনল। পদ্মপাতায় রাধিকা খিচুড়ি ঢেলে ঢেলে দেবেন। কলাপাতায় ভোজ খাওয়া যেমন।

নদীর ঘাটে একটুকু জায়গা কঞ্চির বেড়ায় শক্ত করে ঘেরা। চান করবে তো ঐ ঘেরের মধ্যে—পথিকজনের সুবিধার্থে খেয়ার ইজারাদার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

অকূল গাঙে এমন খোপ-কাটা কেন? সৈরভী জিজ্ঞাসা করল।

মাঝি বলল, যাও না গাঙে নেমে। জল থেকে উঠে দেখবে, বাঁ-হাতটাই নেই। হাত কি হলো, হাত কোথা গেল? টেরও পাওনি কামটে কখন কুচ করে কেটে নিয়ে গেছে। রক্ত পড়ে গাঙের জল রাঙা হয়ে যাচ্ছে।

তেল মেখে ফেলেছে সৈরভী। স্নান বাতিল—মা গঙ্গার নাম করে ঘটির জল একটু মাথায় থাবড়ে দিল। সাতকড়ি ভরসা দিচ্ছে : আহা, ঘেরা জায়গায় ভয়টা কি? বেড়া গলে পুঁটিমাছটাও সেঁধুতে পারে না, ঐখানে যাও তুমি।

তা কে বলতে পারে! জলে-ডোবা বেড়া—খানিক খানিক হয়তো বা ভেঙে গেছে জলের নিচে, দেখতে পাচ্ছিনে। কুমির-কামট ওত পেতে রয়েছে। গাঙে না গিয়ে শেষটা সৈরভী পদ্মবনের এঁদো জলার দিকে গুটি-গুটি চলল।

ছটা সৈরভীর পিছু পিছু যাচ্ছে। একটু গিয়ে পাক খেয়ে চু-উ-উ করে বুড়ি-চ্ছু খেলার মতো দম ধরে গাঙের দিকে ছুটল। ঘাটের দিকে গেল না সে, ঘেরের বাইরে মুক্ত গাঙে ঝপাস করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। ভুস-ভুস করে ডুবের পর ডুব দিচ্ছে সর্বচক্ষুর সামনে।

কী সর্বনাশ! ছইয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁপছেন রাধিকা, চেঁচামেচি গালি-গালাজ করছেন. উঠে পড় লক্ষ্মীছাড়ী, শিগগির ওঠ। ডাকাত-মেয়ে পথের উপর কী বিভ্রাট ঘটায় দেখ!

ভিজে কাপড় সপসপ করতে করতে ছটা সামনে এসে হি-হি করে হাসে : কামটে কাটেনি মা, হিসেব করে নাও। হাত আছে, পা আছে, নাক-কান-চোখ সমস্ত ঠিকঠাক আছে। মিথ্যেমিথ্যি লোকে ভয় দেখায়, হাতে হাতে সেইটে দেখিয়ে দিলাম।

সৈরভীর দিকে নজর পড়ে হেসেই খুন : দেখ দেখ, কাদা মেখে ভূত হয়ে আসছে। এ নাওয়ার দরকারটা কি ছিল? বসে পড়ো এখানে সৈরভী-দি—

গলুইয়ে বসিয়ে গাঙের জল ঘটি ঘটি তুলে তার গায়ে ঢালছে। গাঙে হাত ডুবিয়ে জল তুলছে, সকলে হাঁ-হাঁ করে, ছটার ভ্রূক্ষেপ নেই। রাধিকা এসে হাতের ঘটি কেড়ে নিয়ে সেই ঘটিরই এক ঘা পিঠের উপর। মার খেয়ে ছটা হাসে।

চালে-ডালে খিচুড়ি, মশলার মধ্যে নুন ও আস্ত লঙ্কা। আর সর্ষের তেল খানিকটা। তাই যেন অমৃত। ঝুরি-নামা অশ্বত্থতলা বেশ কেমন ঘর-ঘর দেখাচ্ছে। তলায় শুকনো পাতা পড়ে পড়ে গাদা হয়েছে, কিছু ঝেঁটিয়ে ফেলে পদ্মপাতা নিয়ে সারবন্দি সব বসে গেল। রাধিকা একবাটি দুবাটি করে সকলের পাতে দিয়ে গেলেন। পথের রান্নার আলাদা কেমন স্বাদ—খেয়েছে যারা, তারা বলতে পারবে। কিসমিস-দেওয়া ঘিয়ের মোহনভোগ বাড়িতে ছটার মুখে রোচে না, সেই মেয়ে পথের এই আজব খিচুড়ি চেটে-মুছে খেল, কণিকামাত্র পড়ে নেই।

রাধিকা ছটাকে ডাকলেন : রাত থাকতে উঠেছিলি, ভিতরে আয়, ঘুমিয়ে নে একটুখানি।

সুশীল সুবাধ্য মেয়ে মায়ের পাশটিতে ঝুপ করে শুয়ে পড়ল—শুয়েই চোখ বোঁজা। বসে বসে ঘুমানোর ব্যাপারে সাতকড়ির খ্যাতি আছে, ঘুমের জন্য তাকে শুতে হয় না। একটা গুঁড়ির উপর পা ঝুলিয়ে বসে দিব্যি সে ঘুমিয়ে পড়ল। নাইয়াদেরও ঝিমুনি ধরেছে- কিন্তু একটু পরেই নৌকো ছাড়বে, ঘুমোয় কখন? কড়া দা-কাটা তামাক টেনে টেনে ঘুম তাড়াচ্ছে।

ছটা চুপিসারে কখন উঠে পড়ে মাঝির সঙ্গে ভাব জমিয়েছে—বকর বকর করছে। হাল ধরে একটুখানি সে বসবে। মাঝিও গররাজী নয়, সবুর করতে বলছে। বড়গাঙের মধ্যে এখন নয়—এর পরে দোখালায় ঢুকব, তখন হাল ধোরো। যাচ্ছি এখনো অনেকক্ষণ—তার মধ্যে শিখিয়ে পড়িয়ে তোমায় পাকা মাঝি বানিয়ে দেবো দিদিমণি। নৌকো নিয়ে একলা যেমন খুশি বেড়িও।

ঘোলা জল। ঝুঁকে পড়ে ছটা জলে হাত ডোবায়, কথা শোনে না। তরতর করে ডিঙি যাচ্ছে, হাতে জল কাটছে—খাসা লাগে। এককোশ জল তুলে মুখে দিয়ে থু-থু করে ফেলে দিল।

মাঝি হাসছে : খেলে না যে বড়!

কাটাখালিতে, আজকেই ভোরবেলা, ছিল ফটিকজল। দুপুরে ট্যাংরামারির জলে চান করেছে, রান্না করাও গেছে, খায়নি অবশ্য সে জল। এখন, এ যে,

বিষমকুট—গালে তুলেছে তো মুখ একেবারে নুন-নুন হয়ে গেছে। *

পরের দিন অপরাহ্নে সজনেখালি—বাদাবনের দরজা। বোট গেরাবি করে আছে, ডিঙি তার গায়ে লাগল। সরকারি কাজে আটকা ছিল বলে বোট কাটাখালি অবধি যেতে পারেনি। দরকারও ছিল না, ছোটখাট গাঙে ডিঙিই যথেষ্ট। ডিঙি বরঞ্চ তাড়াতাড়ি এসে পেঁছল।

ডিঙি ছেড়ে বোটে এইবার। জিনিসপত্র তুলে ফেলল। জলের উপরে ভাসমান দিব্যি একখানা ঘর। বোটে রান্না, বোটে স্নান, বোটে ঘুম। মাটিতে যা-একটু পা ঠেকিয়ে নিতে পার এইখানে। আর পা দেবে সেই ফরেস্ট-অফিসে গিয়ে: সে-ও মাটি নয়, তক্তার পাটাতন—এই বোটে যেমন আছ, প্রায় তেমনি।

সাতকড়ির সঙ্গে গল্পে গল্পে ছটা সব জেনে নিচ্ছে। সাতকড়ি বলে, সব ভাল। খাওয়ার সুখ, পয়সাকড়িতে সুখ, হুকুম-হাকামে সুখ। বনকরের লোক আমরাই বা কে, আর কলকাতার লাট-বাহাদুরই বা কে! কাজে কর্মে কোথা দিয়ে দিন চলে যায়, আমরা টেরই পাইনে। তবে সঙ্গীসাথী পাবে না বলে তোমার একটু কষ্ট হবে গোড়ায় গোড়ায়। পরে অভ্যাস হয়ে যাবে। এটুকুও হতো না। আমার ভাগনে মণিকে জানো না, নন্দনপুরের মণিলাল, নড়াল কলেজে বি-এ পড়ছে—

জানে না আবার! ছটা জানে না তল্লাটে এমন কে আছে? তবে জানাই শুধু, বেটাছেলে বলে ঘনিষ্ঠতা হয়নি। মানে চুলোচুলি মারামারি এই সমস্ত বাদ, মুখ ভ্যাংচানি অবধি হয়ে ইতি পড়েছে। ছবির নেশা মণিলালের। তুলি আছে, পেন্সিল আছে, রঙের কখনো-সখনো অভাব পড়লে গাছ-গাছালির সঙ্গে দোকানের এটা-ওটা মশলা মিশিয়ে মতলব মতন রঙ বানিয়ে নেয়।

ছবি এঁকে একবার ছটাকে দেখিয়েছিল : কার ছবি বল তো!

ছটা প্রণিধান করে বলল, গরু—মুংলি গরুটা বোধহয়।

তোর মুণ্ডু—। বলে ছটার হাত থেকে মণিলাল ছবি ছিনিয়ে নিল। দিনের পর দিন আয়নার সামনে বসে অনেক যত্নে নিজের ছবি এঁকেছে, আর ছটা বলে কিনা গরু। তারপরেও আবার তর্ক : মাথার দু-পাশে দুটো শিং ঐ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

মণিলাল বলেছিল, তোরও একটা ছবি আঁকছি দাঁড়া না—লেজ তুলে চার হাতে গাছ বেয়ে উঠছিস।

সাতকড়ি বলছে, মণি বড্ড জ্বরজারিতে ভুগছে। কুইনিন খেয়ে দু-দিন চারদিন ভাল থাকে, আবার পড়ে। একেবারে কাঠিখানা হয়ে গেছে। ওর মাকে বললাম, বাদায় আমার কাছে কিছুদিন থেকে আসুক। নোনায় ফাঁকার মধ্যে জ্বর পালাতে দিশে পাবে না। রং কালো হয়ে গেলেও দেহ তাগড়াই হবে। এখন হলে একসঙ্গে যেতে পারত। কিন্তু কলেজ রয়েছে। তাছাড়া একজনদের

ছেলে পড়িয়ে সেখানে খাওয়া-থাকা পায়—সে ছেলের একজামিন। বোশেখ মাসে গরমের ছুটিতে যাবে।

নদী এখানটা চওড়া খুব, কিন্তু শেষ-ভাটায় জলধারা সরু হয়ে গেছে। ওপারে বন—এপারে মানবেলা, সজনেখালি। বনের ফাঁকে ফাঁকে অনেকদূর অবধি নজর চলে। তখন মনে হবে, বন নয়—বাগবাগিচা। তলায় তলায় এগিয়ে গেলে ঘরবাড়িও পাওয়া যাবে। এপারে ঘাটের উপর মোটা মোটা গাছ কয়েকটা, কেওড়াগাছ—ডাঙা অঞ্চলে এ-গাছ বড় দেখা যায় না। ঝড়ঝাপটা ও স্রোতের টানে ইতস্তত কয়েকটা উপড়ে পড়ে আছে।

হাটবার আজ, হাট বসেছে। বাদা অঞ্চলের বড় হাট সজনেখালি। বিস্তর হাটুরে মানুষ—নৌকোয় নৌকোয় ধুল-পরিমাণ।

সাতকড়িকে উঠতেই হবে হাটে। কোয়ার্টারের গিন্নি যাচ্ছেন, মেয়ে যাচ্ছে, হাট না করলে খাবে কি হপ্তাভোর?

সাতকড়ি উঠে যাচ্ছে তো ছটাও কি ছেড়ে দেবে?

মা তুমি 'না' কোরো না। মাটিতে পা ছুঁইয়ে আসি। পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরেছে, ছাড়িয়ে আসি একটু।

সাতকড়ি বলেছিল নামার কথা, সে-ই এখন আবার ভয় দেখাচ্ছে: কত কাদা ভাঙতে হবে ঠাহর পাচ্ছ? নোনাকাদা কী বস্তু জানো না, কলসি কলসি জল ঢেলেও ধুতে পারবে না।

পড়ে-যাওয়া এক গাছের দিকে ছটা আঙুল দেখায়: কাদায় যেতে যাব কেন জেঠা? দিব্যি ঐ গাছের উপর দিয়ে পাড়ে গিয়ে উঠব।

সৈরভী বলল, পা পিছলে যায় তো চিত্তির। কাদায় গড়াগড়ি খাবে।

কাজের গরজে সৈরভী দিদি হয়ে গেল। ছটা বলে, তুমি আছ সৈরভী-দিদি, পা পিছলাব কেন? পাশে পাশে তুমি যাবে, তোমার কাঁধে হাত রেখে কাদা বাঁচিয়ে দিব্যি পাড়ে গিয়ে উঠব।

রাধিকা গলুইয়ের উপর। বললেন, উনি ভর দিয়ে যাবেন বলে সৈরভী কাদায় কাদায় যাবে। আবদার!

তার আগেই এক ধাক্কায় ছটা সৈরভীকে কাদায় নামিয়ে দিয়েছে। মায়ের কথার জবাব দিল: একজনে কাদা ভাঙলেই হয়ে যায়, দু'জনের ভেঙে তবে লাভটা কি? হিংসুটেরাই ঐরকম করে, আমার সৈরভীদিদি সে-রকম নয়।

নৌকোয় নৌকোয় ঘাটের জল দেখবার জো নেই। পায়ে হেঁটে আর ক'টা মানুষ আসে—পথঘাট নেই, হাঁটবেই বা কোথা? মানুষ এখানে জলচর। অবাক হলো নৌকোর ভিড়ের মধ্যে একটা ডিঙির উপর নজর পড়ে গিয়ে। বিশাল ভুঁড়ি বের করে কালো কালো বেঁটেখাটো কতকগুলো লোক দু-সারি হয়ে ডিঙি জুড়ে বসে রয়েছে। হঠাৎ দেখে মনে হবে এইরকম। মিঠে জল মেটে-

জালা ভরতি করে জঙ্গলরাজ্যে নিয়ে যাচ্ছে।

ধান-চাল হাঁস-মুরগি ও ডিমের অফুরন্ত আমদানি। আর এসেছে মাছ। কত নেবে, কত খাবে। আর দুটো নতুন জিনিস, ডাঙামুলুকে যা হাটেঘাটে পাও না—মধু আর হরিণের মাংস। ঘাটে উঠেই প্রথমে দেখবে, কলসি কলসি মধু বেচতে বসে গেছে। লালচে মধু, আর কাচের মতন স্বচ্ছ সাদা মধু। সাদা মধুর দরটা কিছু বেশি—চিনি আর গুড়ের যে পার্থক্য। বিনিপাশে বেআইনি ভাবে মারা হরিণের ছাল ছাড়িয়ে বেচতে নিয়ে আসে, দাম সস্তা। হরিণের মাংসের মজা এই, যত পচবে খেতে তত ভাল। টক-টক স্বাদ, বেশি কেওড়াপাতা খায় বলে—পচলে সেটা মিইয়ে আসে।

সওদা সারা করে সাতকড়ি বোটে ফিরল। কাঁধের ঝুড়ি ভরতি নটেশাক, কচুশাক, কলমিশাক, উচ্ছে, বেগুন, কাঁচকলা, ঝিঙে। বিষম হাসিখুশি, সাত রাজার ধন মাণিক পেয়ে গেছে আজকের হাটে। অজাঙ্গ বাদাবাদ্যে আনাজ-তরকারি মাণিকই বটে।

মাছ আনেননি? রাধিকা শুধালেন।

সামান্য এনেছি। বেশি কি হবে। কাল বিকেল নাগাত গিয়ে পড়ব, তারপরে তো মাছে মাছে ছয়লাপ।

ঝুড়ির উপর দিকে তরকারি, নিচে মাছ। পারশে ভাঙাল আর পায়রাচাঁদা।

রাধিকা বললেন, এই আপনার সামান্য হলো? খাবো তো চারজন আমরা। কমসম আপনি কিনতে পারেন না।

মুখ কাচুমাচু করে সাতকড়ি বলে, কি করি বউমা। দরদাম করিনি, কিচ্ছু না—দুয়ানি ফেলে দিলাম, এলগুলো দিয়ে দিল। বোটে চেপে যাচ্ছি সর্বজনার চোখের সামনে দিয়ে, বাবুর একটা নামডাক আছে—দু'আনার নিচেই বা বলি কেমন করে? তা আমরা আছি, দাঁড়িমাঝিও এতগুলো যাচ্ছে—মাছ তাদের কিছু কিছু দিয়ে দিলে হবে।

পায়রাচাঁদা একটার দুরন্ত সাইজ—বগিথালায় ফেললে পুরোপুরি জুড়ে যায়। সাতকড়ি বলল, মা-জননীর কথা ভেবে এনেছি। মাছটা কেটে ফেলিসনে সৈরভী, আস্ত এমনি দিতে হবে।

রাধিকা আপত্তি করে বললেন, দে মশায়ের যেমন কথা! মেয়ে মাছের তো সিকির সিকিও খেতে পারবে না।

সাতকড়ি বলে, যদ্দুর পারে পারবে, আর সব ফেলে দেবে গাঙের জলে। খাওয়ার জন্যে তো নয়, দেখার জন্যে। মা-জননী খাচ্ছে, মাছে থালাখানা জুড়ে রয়েছে—আমরা সব দেখব।

রাধিকা কি বলবেন আর প্রবীণ মানুষের কথার উপরে! চুপ করে গেলেন।

সুমুখ-আঁধার রাত্রি। চড়ন্দার সকলে শুয়ে পড়েছে, হঠাৎ তোলপাড় পড়ে গেল। ভূমিকম্প? জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড। এধারের বাক্সপেঁটরা ওধারে চলে যাচ্ছে। উনুনটা কাত হয়ে পড়ল। শিকেয় ঝোলানো হাঁড়িকুড়ি দোলনার ছেলের

মত প্রচণ্ডবেগে এদিক-ওদিক দুলছে। হড়াস করে বিশাল এক ঢেউ কামরার ভিতরে ঢুকে বিছানা-কাপড়চোপড় ভিজিয়ে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। ছটা চেঁচিয়ে উঠল, যে যেখানে ছিল উঠে পড়েছে। সাতকড়ি আগনৌকায় বেরিয়ে পড়ছিল—দাঁড়িমাঝি সমস্বরে না-না করে ওঠে : মানুষসুদ্ধ ভাসায়ে গাঙে নিয়ে ফেলবেনে, টাল সামলাতি পারবানে না।

বোট, মনে হলো, ভুস করে পাতালে ডুব দিয়েছে। জলের তলে সকলে। তবু কিন্তু ডোবে না, ভেসে ওঠে পরক্ষণে। দাঁড়িরা সর্বশক্তিতে বাইছে। ঝুঁটোয় পা আটকানো—দাঁড়টানার মুখে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ে, আবার খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। কাড়ালের উপর মাঝিও কষে হাল বাইছে, দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে গায়ে। রাধিকা জবুথবু হয়ে মাঝির দিকে মুখ করে বসেছেন। মাঝি সাহস দেয় : ভয় কি মা-ঠাকরুন। এক্ষুনি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে নে। তিরমোহিনীর এইখানটা এটু গোলমাল করে। পার হয়ে গেলাম বলে। অন্ধকারে যা দেখা যায়—জল আর জল। তিন নদী এক জায়গায় মিলেছে—কূলের সাকিন নেই।

মাঝির কথা ঠিক—খুব খানিকটা ধুন্দুমার করে হঠাৎ জল শান্ত হয়ে গেল। বোট তরতর করে যাচ্ছে, মাঝি কলকে ধরাল। বনের মাথায় চাঁদ দেখা দিয়েছে, চারিদিক দিব্যি স্পষ্ট হয়ে এল। মোহানা কাটিয়ে এসে এখন এক ছোট গাঙে পড়েছে। এপার-ওপার দু-পারই নজরে আসে।

বন উভয় দিকে। গোলঝাড়—কী বাহার মরি মরি! নারকেলের মতন পাতা ভুঁই ফুঁড়ে উঠেছে, জ্যোৎস্নায় ঝিলমিল করছে, বাদামি ফলের কাঁদি কাঁদি ঝুঁকে পড়েছে জলেব উপর। হেঁতাল—ঠিক যেন খেজুরগাছ। ঝুপসি ঝুপসি গেঁয়োগাছ। বড়গাছও কত—সুঁদুর গরান পশুর কাঁকড়া খলশি বাইন কেওড়া ধুধুল। আঙুল তুলে সাতকড়ি দেখিয়ে দেখিয়ে যাচ্ছে। বুনোলতা গাছেদের মাথায় মাথায়, পায়ের গোড়ায় সূচোল-মুখ শুলো। নেমে যে আরামে হাঁটবে সেটি হচ্ছে না—পা রক্তাক্ত করে দেবে। বনের দেশে এসে পড়লাম, মানুষ পছন্দ-সই নয় এদের। ঢোকবার মুখে ত্রিমোহিনীর গাঙ কী রকম নাস্তানাবুদ করল, দেখলে না!

পরের দিন। দুপুর গড়িয়ে গেল, ছটার আর ভাল লাগছে না। জল আর বন। মাঝে-মধ্যে এক-আধটা নৌকোর দেখা মেলে, মানুষ দেখা ও মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা সেইসময়। সে জিনিস খুব কম হয়ে পড়েছে এখন। নদী প্রকাণ্ড হয়েছে—বনের অন্ধি-সন্ধি থেকে কত নদী কত খাল এসে এসে পড়ছে। ও-পার অদৃশ্য। এ-পারও চলে গিয়ে, জল—শুধু জলই বুঝি এর পর। কাটা-খালির সেই গাঙ যেতে যেতে, সত্যি, সাগর হয়ে পড়ল।

সাতকড়িকে বলে, মাঝি পথ ভুল করেছে জেঠা। সাগরে নিয়ে চলল।

সাতকড়ি প্রবোধ দেয় : না রে পাগলি। প্রায় তো এসে গিয়েছি, আর

সামান্য পথ।

ছটা অধীর কণ্ঠে বলে, কাটাখালি ছাড়া থেকে ঐ তো এক কথা তোমার—এসে গেলাম, এসে গেলাম।

বোটম্যানদের জিজ্ঞাসা করে দেখ্—

ওদের চোখ টিপে দিয়েছে জেঠামশায়। ওরা কি আলাদা কিছু বলবে?

সকাল থেকে ছটা আজ এমনি লেগেছে। বোট এখন কূল ঘেঁষে যাচ্ছে। বড় একখানা বাঁক ঘুরে হঠাৎ বাড়ি দেখা গেল। এসেছি—সত্যি সত্যি এসে গেলাম তবে।

দোতলা সমান উঁচু বাড়ি। নদী থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে—সিঁড়ির মাথায় বারান্ডা, আর নিচে জলের উপর কাঠের জেটি।

সাতকড়ি দেখাল : বাবু দাঁড়িয়ে আছেন, ঐ দেখ—

বারান্ডার রেলিংয়ে তিন-চার জন ঝুঁকে ছিল, সিঁড়ি বেয়ে তারা জেটিতে নামল। বোট কাছাকাছি এসেছে, মধুসূদনকে চেনা যাচ্ছে, সকলের আগে তিনি। ছটা চেঁচিয়ে উঠল : বাবা!

এদিকে সেদিকে গেরাবি-করা নৌকো। কাঠের ও গোলপাতার কিস্তি—সুন্দরবনের ভাণ্ডার থেকে ভরা সাজিয়ে নিয়ে ফেরত যাচ্ছে। বাদায় ঢোকবার পাশের দরবার নিয়ে আর কতক ধন্না দিয়ে পড়ে আছে।

॥ পাঁচ ॥

মোটা মোটা খুঁটির উপর তক্তার পাটাতন। তার উপরে ঘর—টিনের ছাউনি। বারান্ডার লাগোয়া অফিসঘর, পিছন দিকে কোয়ার্টার। কসাড়বনের বিঘে কতক জমি খাবলা করে নিয়ে তিনদিকে খুঁটি-তক্তার পাঁচিলে ঘের দিয়ে নিয়েছে। খোলা দিকটায় গাঙ—বাইরে চলাচলের একমাত্র পথ। ডাঙার উপরে পা ফেলে ফেলে যাওয়া—সে বড় কঠিন জিনিস, হরেক রকমের বন্দোবস্ত তার জন্য।

সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছটা সকলের আগে উপরে উঠে গেল। অফিসঘর পার হয়ে বাসাঘরে—শোওয়া-বসা যে ঘরে হবে। তার ওদিকে রান্না-ঘর, স্নানের ঘর। এবং গার্ড ও বোটম্যানদের জন্য কয়েকটা ঘর পাশাপাশি। চারিদিকে এক চক্কোর মেরে উঠানে নামল সে ছোট্ট সিঁড়ি বেয়ে। অনেকখানি জায়গা, উঁচুও বেশ। দু-পাশে দুই পুকুর—পুকুর কেটে সেই মাটিতে জায়গা উঁচু করেছে। পুকুর দেখে ছটার ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে যায়। পুরো তিনটে দিন বসে বসে হাত-পা ধরে গেছে—সাঁতরে বার কয়েক এপার-ওপার করলে চাঙ্গা হতে পারে।

যতীন ছোঁড়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে—চেনা-পরিচয় আছে, মধুসূদনের সঙ্গে একবার মুলটি গিয়ে ছিল কয়েকটা দিন। যতীন বলল, সাঁতার কাটা যাবে না কেন। তবে বিষম কটু জল, মুখের মধ্যে গেলে থু-থু করতে হবে। মিঠা জলের পুকুরও আছে—স্টেশন থেকে সামান্য দূরে। পুরানো পুকুর, কোন আমলে কারা কেটেছিল, কে জানে। সেইদিক দিয়ে বড় সুখ—খাবার জলের অভাব আমাদের নেই।

পিছন দিককার পাঁচিলের ঘেরে ছোট্ট একটু দরজা—মিঠাজল ওই দিকে। তালা-বন্ধ দরজা—খিল হুড়কো ছিটকিনি-আঁটা। জল আনবার গরজ পড়লে তবেই দরজা খোলা হয়। লোকজন নিয়ে খুব সতর্ক হয়ে পাঁচিলের বাইরে যায়।

রাত্রি হল। ভাত-তরকারি আজ পয়লা দিন যতীন শোবার ঘরে নিয়ে এল। খাওয়া-আঁচানো ঘরের মধ্যেই। দিনমানে এঘর-ওঘর উঠোন-রান্নাঘর কোরো—রাত্রিবেলা বেরিয়ে কাজ নেই। কোন স্টেশনের উঠোনে সেদিন নাকি বাঘ ঘুরতে দেখা গেছে। গরমের রাত্রে সাপেরা তো আকচার যত্রতত্র হাওয়া খেয়ে বেড়ায়। বনরাজ্যে দিবারাত্রি তাদের ষোলআনা রাজত্ব ছিল—দিনমানটা আমরা দখল নিয়ে নিচ্ছি, রাত্রে বাগে পেলে ওরা ছেড়ে কথা হইবে না।

ছটার খারাপ লাগছে। জনপ্রাণী নেই, বনের মতন তাকেও বোবা হয়ে থাকতে হবে। হাঁটা-চলার জায়গা নেই—অচল পা-দুটো দিয়ে ঠিক একদিন গাছের মতোই শিকড় বেরিয়ে যাবে। পাঁচিলের লাগোয়া বিশাল ঐ কেওড়া-গাছ—আর ঘরের মধ্যেও তো একটা গাছ, হ্যাঁ গাছই বলতে হবে—গাছের নাম ছটাকি।

গাঙে গাঙে তিনদিন-তেরাত্তির পরে মেজেয় ঢালা-বিছানা। চোখ বুজে মনে হচ্ছে এখনো বোটের উপরে—ঘরের কাঠের মেজে হুবহু সেই বোটের পাটাতন। একঘুমের পর জেগে উঠেও সেই অনুভূতি—বোটে ভেসে যাচ্ছে, নিচে জলস্রোত। চোখ মেলে ছটা এদিক-ওদিক তাকায়। বারান্ডায় সারারাত আলো ঝোলানো থাকে—অকূল গাঙে মাঝিমাল্লাদের নিশানা। ঘুলঘুলি দিয়ে কিছু আলো ঘরে ঢুকেছে। বোট ছেড়ে ঘরে এসে শুয়েছে—তখন আর ছটার সন্দেহ থাকে না। জলের আওয়াজ কেন তবে—যেখানটা শুয়ে আছে ঠিক তার নিচে? ছলাৎ ছলাৎ করে জল প্রহৃত হচ্ছে। ভয় পেয়ে গেছে সে—বাবা বাবা করে ঘুমন্ত মধুসূদনকে ডাকে।

কি রে?

ঢেউ ভাঙছে যেন মেজের নিচে?

গাঙে জোয়ার লেগেছে—। মধুসূদন নির্বিকার ভাবে বললেন।

ঘরের মধ্যে গাঙ?

ঘরে বাইরে সব জায়গায়—

মধুসূদন আমল দিলেন না। বলেন, জোয়ারে এই রকম হবে, ভাঁটায় জল নেমে যাবে। ঘুমো তুই।

পাশ ফিরে নির্ভাবনায় তিনি ঘুমোতে লাগলেন।

বনকে ছটা বোবা ভাবছিল—একেবারে যে উল্টো! মানুষে আর কটা কথা বলে, বনের কলরবে ভোর হতে না হতে ঘুম ভেঙে যায়। শতেক দিক থেকে একশ রকম কণ্ঠে বনের কথা। মোরগ ডাকে কোঁকর-কো কোঁকর-কো ঘোর জঙ্গলের মধ্যে -গাঁ-গ্রামে যেমন ডাক শুনি: বনমোরগ—শিকারীরা মাঝে মধ্যে অফিসে ভেট দিয়ে যেত, ছটা পরে দেখেছে। পোষা-মোরগের মতোই—রংটা কিছু বেশি ঘোরালো। (একবার গাছের কোটরে হাত ঢুকিয়ে, মোরগ নয়—মোরগের পেটের নিচে থেকে নিজেই ছটা ডিম চুরি করে এনেছিল। যাক গে, বলবেন না যেন কাউকে।) বনের অধিষ্ঠাত্রী বনবিবির নামে মানত করে লোকে বাদায় ঢোকে। পাঁঠা-মোষে দেবীর অরুচি, মোরগটা বেশি পছন্দ করেন। বলি দিতে হয় না, দেবীর নামে ছেড়ে দিয়ে আসে। তাদেরই ছা-বাচ্চারা জঙ্গলের যত্রতত্র চরে বেড়ায়। ওড়েও বটে।

কত রকমের পাখি! বনটিয়া শামখোল করমকুলি কাস্তেচোরা বাঁশকুরাল

বিলবাগচু দুধরাজ রক্তরাজ ভীমরাজ—নামে নামে মহাভারত হয়ে যাবে। পাখির বাতান আছে, যতীন বলল—মিঠাপুকুরের ধারে কয়েকটা কেওড়া ও ওড়া গাছের উপর। কিচির-মিচিরে কানে তালা ধরিয়ে দেয়।

শুধু পাখি? কথা না বলে কে জঙ্গল-রাজ্যে? গাছপালা জলবাতাস—মানমেলার মধ্যে যারা চুপচাপ নিপাট-ভালমানুষ—বাদাবনে এসে হুল্লোড় দেখ তাদের।

যতীন বলল, আরও তো শোননি খুকু, কাতর হয়ে রাত্রে ঘুমুচ্ছিলে। হরিণের ডাক, বাঘের ডাক। ডাকের মধ্যেও ঘোরপ্যাঁচ কত। থাকো, বুঝতে পারবে।

রাধিকা রান্নাঘর নিয়ে পড়েছেন। রাঁধতে খাওয়াতে ভালবাসেন তিনি চিরকাল। গাঁয়ে মাছ দুর্লভ, সামান্য যা মেলে আগুন-ছোঁয়া দর। মানুষ হিসাব করে এক টুকরো আধ-টুকরোর বেশি দিতে পারতেন না। মাছের অভাব তরি-তরকারিতে পূরণ হতো। এখানে বিপরীত। কত মাছ খাবে, খাও না। জেলেরা দিয়ে যায়—'আর না' 'আর না' করলেও ঢেলে দিয়ে পালায়। তাছাড়াও খাঁড়ির সঙ্গে উঠোনের পুকুরের যোগাযোগ—এক খেওন জাল ফেলে টেনে তোলা দায়। অভাব আনাজের। হাটের সওদা সাতদিন অন্তর আসে, তার মধ্যে আধ-শুকনো তরকারি থাকে এটা-ওটা। সেই হাটবেসাতি কোন হপ্তায় এলোই না হয়তো।

মনের সাধে রাধিকা রকমারি মাছের ব্যঞ্জন বানাচ্ছেন। যতীনকে হাতে ধরে শেখাচ্ছেন—রান্নার রাজসূয় ব্যাপার এঁরা ফিরে যাবার পরেও যাতে চালু থাকে। যতীনের বিষম উৎসাহ—বাবু কতটুকু আর খাবেন, মহানন্দে নিজেই যে সাঁটবে।

॥ ছয় ॥

এক বিকালে মণিলাল এসে পড়ল। ছাত্রের এগজামিন সারা হতেই বেরিয়ে পড়েছে--প্রক্সির উত্তম বন্দোবস্ত আছে, কলেজ বন্ধ হওয়া অবধি অতএব দেরি করা নিষ্প্রয়োজন। সাতকড়িকে চিঠি দেওয়া ছিল—সজনেখালি অবধি গিয়ে ভাগনেকে সে নিয়ে এসেছে।

এসব জায়গায় মানুষ এলে, বিশেষ করে চেনা মানুষ কেউ এলে, উৎসব পড়ে যায়। আর মণিলাল তো নিজস্ব মানুষ একেবারে। সত্যি, খুব রোগা হয়ে গেছে সে। রাধিকা বললেন, দে মশায় কখন আসেন কখন যান, ঠিকঠিকানা নেই। এসে তারপরে তো রাঁধাবাড়া করবেন—অনিয়মে তোমার শরীর সারবে না বাবা। যতদিন আছ, আমাদের এখানেই চাট্টি চাট্টি খেও।

কাসুন্দি আর আমসি নিয়ে এসেছে মণিলাল। বাঘিনী ঠাকরুন দিয়েছেন, না এনে উপায় কি? প্রকাণ্ড একটা ইঁচোড়ও দিচ্ছিলেন। বললেন, মেয়েটা তলায় তলায় আমের গুটি কুড়িয়ে ঘুরত—সে পোড়া দেশে শুনেছি আম-কাঁঠাল নেই। নিয়ে যা, কত আহ্লাদ করবে দেখিস। দূরের গোলমেলে রাস্তা ইত্যাদি বলে অনেক কষ্টে ইঁচোড়টা মাপ হলো, কাসুন্দি-আমসি বয়ে আনতে হলো।

মণিলাল যাচ্ছে শুনতে পেয়ে ভাবিনী বড্ড খুশি। বুড়োমানুষ মাঠ ভেঙে নন্দনপুর অবধি এসে হাজির। বললেন, ছটফটে মেয়ে—গাঁ-ময় হৈ-হৈ করে বেড়াত। একা একা এখন মুখ শুকনো করে চুপচাপ থাকে। তুই গেলে মনের সুখে ক'টা দিন কথা বলে বাঁচবে।

শুনতে শুনতে ছটা ভ্রূকুটি করে : যা যা, দেমাক করিসনে--কত আমার কথা বলার লোক!

মণিলাল আহত কণ্ঠে বলে, দেমাক কিসে হলো। আমি তো বলিনি—তোর জন্যে পিসিমা বড্ড ভাবেন, তিনি বলেছিলেন। আমি আরো বোঝালাম, মেসোমশায় অবিশ্যি কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু মাসিমা তো—

শেষ করতে না দিয়ে ছটা বলে, মা আরও ব্যস্ত—রান্নাঘর নিয়ে। যতীন আর সৈরভীও ব্যস্ত--মায়ের যোগাড় দিতে দিতে দিনরাত্তির হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

মণিলাল সবিস্ময়ে তাকিয়ে পড়ে।

ছটা খিল খিল করে হেসে বলে, নিত্যিদিন যজ্ঞিবাড়ি এখানে।

এত রেঁধে খায় কে?

আমরা যদ্দুর পারি খাই। পাঁচ-ছটা বেড়াল আছে, কোত্থেকে একটা ভুঁদো কুকুর এসে জুটেছে, তারা সব খায়। মাঝেমধ্যে বোটম্যানরাও কেউ কেউ নিয়ে

যায়। বাদবাকি দুই পুকুরের জলে—অগুন্তি মাছ পুকুরে, তারা সব খায়।

মণিলাল বলে, কষ্ট করে এত রাঁধাবাড়ার কি দরকার?

ছটা বলে, সুখই তো রাঁধাবাড়ায়। সর্বক্ষণ মা রান্নাঘরে ওদের সব নিয়ে সুখ করছে। কায়দা পেয়ে গেছে, আর মা ছাড়ে!

জোর দিয়ে আবার বলল, আমার তা বলে মোটেই একলা ঠেকে না, মুখ শুকনো করে আমি থাকিনে। পিসিমা মিছামিছি ভাবেন!

দেশে-ঘরে ভাবিনী-পিসির উদ্বেগ—আবার এখানেও একদিন বাবা-মায়ে ঐ ধরনের বলাবলি হচ্ছে, ছটার কানে গেল। মধুসূদন বলছেন, মেয়েটা বেশ খানিকটা সইয়ে নিয়েছিল। মণি আসার পরে এখন একজুটি হয়ে দুটিতে আছে —চলে গেলে একলা হয়ে পড়বে, বিষম কষ্ট হবে তখন।

ছটার হাসি পাচ্ছে।

মণি যেন একমাত্র সাথী—গেলে বুক চাপড়াবে, আছাড়িপিছাড়ি খাবে! যাক না চলে সে, আর সৈরভী অষ্টপ্রহর বাটনা বাটুক, মাছ কাটুক, যতীন রান্নাবান্নার পাঠ নিক। বয়ে গেছে! বনের সংগে ভাব জমিয়ে নিয়েছে ছটা, অগুন্তি সংগীসাথী এখন। কত রকমের পাখি—ছোটখাট দয়েল ঘুঘু গয়াল বাটাংরা সব, আবার দৈত্যাকার গাড়াপোলা মদনটাক। ভীমরাজ কথা বলে থেকে থেকে, বাঁশকুবাল হুঙ্কার ছাড়ে। বিলবাগচু গাছের মাথায় সারাদিন ঝিমোয়, যখনই তাকাও চুপচাপ বসে রয়েছে– সূর্য ডোবার পরে চরে নামে আহারের চেষ্টায়। উঠোনের ঘাসে তিড়িং-মিড়িং করে ফড়িং লাফায়। নানান রঙের নানান চেহারার মেঘ ভাসে আকাশে, ফুল উঁকিঝুঁকি দেয় ঝোপ-ঝাড় থেকে।

জলে আর জংগলে সারাক্ষণ ধরে খেলা—এই ঝগড়া চলছে, এই আবার ভাব একটু পরেই। বারান্দার উপর ঝুঁকে পড়ে ছটা দেখে, দেখার আর শেষ নেই। ভরা জোয়ারে, দেখ, লাখে লাখে ঢেউ পাড়ের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে, খোকা-খোকা গাছের মুণ্ড চেপে ধরে জলের মধ্যে, ঝাঁকি দিয়ে তখুনি সে গাছ আবার খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। বড় বড় গাছের গোড়ার মাটি ধুয়ে শিকড় সম্পূর্ণ আলগা করে দিয়েছে—দেখতে যেন বুড়োমানুষের শিরাবহুল হাত। শীর্ণ হাতে মোক্ষম-সোক্ষম করে মাটি আঁকড়ে ধরে কোন রকমে টিকে আছে, গাঙের স্রোত ভাসিয়ে নিতে পারছে না। গাছদের দশা দেখে ছটার কষ্ট হয়— হঠাৎ বা সশব্দে আহা-রে বলে ওঠে। মণিলাল তখন হয়তো কাগজে পেন্সিল বুলিয়ে আঁকচোক কাটছে—ছটার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে সে তাকিয়ে পড়ে।

আবার ভাটির সময় দেখ। গাঙের এখন ভাঙা কপাল—পাশা বিলকুল উলটেছে। জল অনেক নেমে গেছে—জংগল থেকে বিস্তর দূরে। মাঝখানে কাদায়-লেপা সমতল দূরপ্রসারী চর। হাওয়ায় লতাপাতার মাঝ থেকে হিস হিস একটা আওয়াজ উঠছে, বিদ্রূপ—কথাগুলোও ছটা যেন শুনতে পাচ্ছে : বড্ড যে বাড় বেড়েছিলে—কেমন জব্দ, কেমন! তবু গাঙ সর্বশক্তি একত্র করে ঢেউ

তুলছে বনের অভিমুখে—দুর্বল ঢেউ, উঠতে না উঠতে ভেঙে যায়। ছাড়ে না—আবার তোলে ঢেউ, আবার ভাঙে। অক্ষম হাস্যকর চেষ্টা—আকাশের চাঁদ-তারাদের ধরবার জন্য বামনের নুলো হাত বাড়ানোর মতো। কাণ্ড দেখে ছটা তো হেসে হেসে খুন। মণিলাল ওদিকে ভেবেই পায় না, আধপাগলা মেয়েটা অত হাসে কি জন্য!

আর মুলটি গাঁয়ে বসে বাঘিনী পিসিমা নিশ্বাস ফেলছেন : আহা-রে, জঙ্গলের মধ্যে নিঃসঙ্গ মেয়েটা মুখ চুন করে রয়েছে।

পাঁচিলের দরজা খোলে এক-একদিন, কলসি নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে মিঠাপুকুরে যায়। ঘাটে বাওয়ালি কাঠুরে যারা থাকে, তারাও জুটে পড়ে ঐ সঙ্গে। ফরেস্ট-গার্ড বন্দুক নিয়ে যাচ্ছে। সমারোহ ব্যাপার। পাঁচিল-ঘেরা দুর্গ থেকে বনরাজ্যে সশস্ত্র অভিযান যেন!

ছটা যেখানেই থাকুক আর যা-ই করুক, ছুটে এসে পড়বে। পাঁচিলের চাবি যতীনের হেপাজতে। এ সময়টা সে এক আলাদা মানুষ। তালা খুলতে খুলতে তাড়া দিয়ে ওঠে : যাও যাও, ইদিকে কি তোমার?

ছটা বলে, বাইরে যাচ্ছি নাকি? উঁকি দিয়ে দেখছি কী সব আছে ওধারে!

যতীন তামাসা করে বলে, ভূত-বেম্মদত্যি জিন-পরীরা সব গাছে গাছে বাসা বেঁধে রয়েছে। সরো সরো, দরজা দিই।

সবগুলো লোক বেরিয়ে গেলে যতীন আবার ওদিক থেকে তালা এঁটে দেয়। তবু ছটা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। কলরব দূরবর্তী হয়ে যায়। ফাঁকা দেওড় করছে কানে আসে।

এক দুপুরে বড্ড সুযোগ এল। ডেপুটি-কনজারভেটরের ডাকে মধুসূদন সাতকড়িকে নিয়ে ভিন্ন এক স্টেশনে গেছেন। যতীন তাস বসেছে জেটির এক কাঠুরে-নৌকোয় গিয়ে। গ্রীষ্মের এই দুপুরবেলা খোলা বারান্ডায় সৈরভী বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে। রাধিকা মেয়েকে গ্রেপ্তার করে নিজঘরে এনে শুইয়ে নিজেই মুহূর্তমাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছেন—তাক বুঝে মেয়ে টিপিটিপি বেরুল। তালার চাবি যতীন রান্নাঘরের চালের বাতায় গুঁজে রাখে, দেখা আছে। নিঃসাড়ে চাল অবধি বেয়ে উঠে চাবি নিয়ে নিল সে। সাতকড়ির ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে, মণিলাল ঢাউশ একখানা বইয়ের পাতা উলটাচ্ছে।

চক্ষু কপালে তুলে ছটা বলে, জেঠা নেই—আজও পড়ছিস?

মণিলাল পরমাগ্রহে বলে, পড়বি তুই? কিচ্ছু তো করার নেই এখানে। পড়াশুনো কর। আমি পড়াব।

তুই?

অবাক হলি যে? নড়ালে থেকে পড়ি যেমন, পড়াইও তো আমি। খুব ভাল পড়াই রে—যাদের বাড়ি পড়াই, তারা বিষম খুশি। বইটই নিয়ে এসেছিস তো?

এই মাহেন্দ্রক্ষণে ঐসব ঝঞ্ঝাটের কথা—ধানের হাটে ওল নামানো একেই বলে থাকে। কথা না বাড়িয়ে ছটা মণিলালের হাত ধরে টান দিল : চল্—

উঠানে নামিয়ে এনেছে। নাছোড়বান্দা মণিলাল বলছে, মেসোমশাইকে বলব পড়ার কথা। বই যদি না এনে থাকিস, এবারে যখন সদরে যাবেন উনিই কেনা-কাটা করে আনবেন।

ভালমন্দ কিছুই না বলে ছটা পাঁচিলের চাবি খুলছে। বলে, মিঠাপুকুর দেখে আসি চল্—

শিউরে উঠে মণিলাল বলে, সর্বনাশ!

চোখে-মুখে ভয় দেখতে পেয়ে ছটা হাসছে। বলে, দেখেশুনে বেরিয়েছি। ঘুমুচ্ছে সবাই, টের পাবে না।

ঘরে টের না পাক, জঙ্গলের ওরা টের পাবে ঠিক। ওরা ঘুমোয় না।

কাতর হয়ে মণিলাল আবার বলে, কেন পাগলামি করছিস? ফের্—

ক্রুদ্ধ হয়ে ছটা বলল, একাই আমি যাবো, তোর যেতে হবে না। ভীতু কোথাকার!

ম্যাচ-ম্যাচ করে সে চলল। ক'পা গিয়ে তালা আঁটবার কথা মনে পড়ে গেছে—পিছনে ঘুরে দেখল, মণিলালও বেরিয়ে এসেছে।

নরম কণ্ঠে তখন বলে, তুই কেন আসতে গেলি? একাই তো যাচ্ছিলাম।

চটে উঠে মণিলাল বলল, যেতে যেতে কদ্দুর চলে যেতিস—তোর কি মাথায় কিছু আছে?

কথা শুনে ছটা ফিক করে হেসে ফেলল : যাই-ই যদি, পিছনে তুই বুঝি পায়ে দড়ি দিয়ে টানবি?

পরক্ষণে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে, ঘরের লোক দেখেনি—জঙ্গলের ওরা কি আর নজর পেতে বসে রয়েছে? আর দেখলেই বা কি, বন্দুক সঙ্গে নেই কেমন করে বুঝবে? কোনো মিঞা ধারে-কাছে আসবে না দেখিস—যতীনদের বেলাও তো আসে না।

কত ফুল, দেখ দেখ, বাদাবন এক সাজানো বাগান। খলসিফুল, হেঁতালফুল, কেওড়াফুল, গেঁওফুল, গরানের ফুল—এসব গাছ ছটার চেনা হয়ে গেছে—আরও কত কত নাম-না-জানা ফুল। সাদা খইয়ের মতন ছোট্ট ছোট্ট ফুল—শালুক ফুল কি ওগুলো? লতাই বা কত রকমের! পত্রহীন সরু সোনালি লতা—সোনার সাতনরী হার পরে বাহার করে আছে গাছেরা। মৌমাছি উড়ছে, প্রজাপতি উড়ছে। মণিলাল আগেই যা বলে রেখেছে—ফুল তুলতে তুলতে এগুচ্ছে ছটা। এগুচ্ছেই। ছুটে ছুটে ফুল তোলে—এক হাতে কুলোয় না, এ-হাত ও-হাত দুই হাতে। মণিলালকে দিচ্ছে, কোঁচার কাপড়ে কোচড় বানিয়ে নিয়েছে সে। জোগার গোনে এ সমস্ত জায়গা ডুবে যায়। মিঠাজলের প্রয়োজনে যখন-তখন যেতে হয়

বলে উঁচু করে ভেড়ি বাঁধা আছে মিঠাপুকুর অবধি। ভেড়ির উপর থেকে কতটুকুই বা হাত যায়—ছটা নিচে নেমে পড়ল। নোনা কাদায় পায়ের এক বিঘত ডুবে গেছে—এ কাদা ছাড়ানো চাট্টিখানি কথা নয়। সে যাকগে, সে তো পরের কথা। পাগল হয়ে ছটা ফুল তুলছে, ফুলের দস্তুরমতো এক বোঝা—

মণিলাল বলে, অনেক তো হলো। ঘরে চল্ এবারে—

ছটার কানে যায় না। হাতের নাগালে তেমন আর পাচ্ছে না তো গাছেই উঠে পড়ল সে। ফনফন করে কাঠবিড়ালির মতো এ-ডাল ও-ডাল করছে। এই কর্মেও এত বড় ওস্তাদ, কে জানত। ফুল দেখে এক-একবার মগডাল অবধি চলে যায়, ডাল নুয়ে পড়ে।

মণিলাল সভয়ে নিচে থেকে বলে, ডাল ভেঙে পড়বি রে ছটা। হাত-পা ভাঙবে।

এবারে কানে গেছে। যাঃ—বলে মণিকে নির্ভয় করে : হাত-পা কেন ভাঙবে —কাদা না নিচে?

তখন মণিলাল ভিন্ন পথে যায় : কতক্ষণ বেরিয়েছি খেয়াল আছে? বাসার সব জেগে উঠলে রক্ষে থাকবে না।

ফিরতি মুখে হুঁশ হলো, ফুল তো দেদার তুলেছি—ফুলের এখন কি গতি করা যায়? একটি মাত্র ফুল নিয়েও বাসায় ঢোকা যাবে না, জেরার তলে পড়তে হবে। যত্রতত্র ফেলে দেওয়াও যায় না—জল নিতে এসে লোকের নজরে পড়ে যাবে, এক জায়গায় এত ফুল দেখে প্রশ্ন জাগবে মনে। চট করে ছটার মাথায় এসে গেল, অনতিদূরে খাড়ি মতন একটা নজরে এসেছে—সেই জলে বিসর্জন দেওয়া যাক।

রং-বেরঙের খাসা খাসা ফুল—আহা, কোঁচড় থেকে মুঠো মুঠো করে নিয়ে দুজনে জলে ছুঁড়ছে। ভাসতে ডুবতে টানের মুখে ফুল অদৃশ্য হয়ে গেল। বনের জিনিস আবার বনকে দিয়ে দিলাম, মা-বনবিবি জলের নিচে থেকে নিয়ে নিলেন। দেখতে পেলে না, ঠিক হাত পেতে নেওয়ার মতন?

ফুল ফেলে দিয়ে বিষণ্ণ মুখে ফিরছে—আরে দেখ দেখ—হরগোজা ঝাড়ের উপর কী এক বস্তু চকচক করছে। কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে ঝাড়ের মধ্যে ছটা চলে এল। মৌচাক এক টুকরো—ঝড়-বাতাসে কোন গাছ থেকে ভেঙে এসে পড়েছে। কাচের মতন স্বচ্ছ মধু ভিতরে।

ছটা বলে, মাকে ফুল দিলাম, মা আমাদের মধু খেতে দিয়েছেন।

চাকসুদ্ধ মুখে পুরল দুজনে। চুষে চুষে মধু খেতে মজা। ছটা বলে, বন কত কি দেয় দেখলি? ফাঁক পেলেই আমরা বনে চলে আসব, কেমন?

॥ সাত ॥

এত ঢাকাঢাকি, ব্যাপারটা তবু না-জানি কেমন করে বেরিয়ে গেল। কী ডাকাতে-মেয়ে রে বাবা, শখ করে বাঘের মুখে চলে গিয়েছিল। চুলের মুঠো ধরে মধুসূদন ঠাস ঠাস করে দিলেন কয়েকটা চড় : নাকে খত দে, কোনোদিন আর বাড়ির বার হবিনে—

রাধিকা এসে পড়ে মেয়েকে ছাড়িয়ে নিলেন। স্বামীকে দোষেন : মর্দানিতে তোমরাই তো আসকারা দিয়েছ—তোমার দিদি আর তুমি। গোড়া কেটে আগায় জল ঢালতে হবে না। নিজের কাজে যাও তুমি।

মধুসূদন গজরাচ্ছেন : আর কখনো যাবিনে বল্—

রাধিকাই বলেন, যাবে না। আমিই বলে দিচ্ছি। কেমন করে যাবে? যতীন যেখানে-সেখানে চাবি ফেলে রাখত, আমি নিয়ে এখন বাক্সে পুরেছি। চাবি আর হাতাতে হবে না বাছাধনের।

বাপের মার খেয়ে কাঁদছে বটে ছটা, কিন্তু চাপা হাসিও ঠোঁটের কোণে। বাবার হাতের মার কখনো বৃথা যায় না, পরিবর্তে একটা কিছু পাবেই। আর হাসি পাচ্ছে মায়ের ঐ দেমাকের কথা শুনে। তালা না খুলে যেন পাঁচিল পার হওয়া যায় না।

কায়দা একটা ইতিমধ্যেই ছটা ভেবে নিয়েছে। এবং শুধু ভাবনা মাত্র নয়, হাতেনাতে কাল দুপুরে খানিকটা পরখও করেছে। উঠানের পাশে পাঁচিলের লাগোয়া ঐ কেওড়াগাছ, আর পাঁচিলের ঠিক ওপারে হেঁতালবন—নজর ফেললেই তো মাথা আপনাআপনি খুলে যায়। কেওড়া-ডালে ঝুল খেয়ে হেঁতালবনে গিয়ে পড়া খুব সোজা নয়—বুকে সাহস চাই এবং লম্ফটা ঠিক তাক মতন হওয়া চাই। কিন্তু সাহস ও কষ্টের কাজ বলে মজাটাও তেমনি বেশি। বনমুরগি ডাকে খুব ঐ দিকটায়, বাসা আছে নিশ্চয় কোন গাছের গর্তে। বাসা খুঁজে নিয়ে মুরগি ধরা ছটার ইদানীং মাথায় ঘুরছে।

ইচ্ছা যখন হয়েছে, দেরি করা ঠিক নয়। কেওড়াগাছের দিকে, ধরো, মধুসূদনেরও নজর পড়ে গেল, সন্দেহবশে তিনি গাছ কাটিয়ে দিলেন। হয়ে গেল বাইরে যাওয়া, মোরগ খোঁজা! শুভস্য শীঘ্রম্—সুযোগ পাওয়া মাত্রেই।

এবারে ছটা সম্পূর্ণ একলা বেরুল, মণিলালও নয়। সেদিনের কাজকর্ম চাউর হওয়ার মূলে মণিলালও আছে কিনা বলা যায় না। ঐ ভাল মানুষ-গুলোর পক্ষে সবকিছুই সম্ভব। মণিলালকে নিয়ে কোনরকম উচ্চবাচ্য হলো না, সন্দেহ ঘনীভূত আরো সেই কারণে। হয়তো বা কৈফিয়ত দিয়েছে, ছটা

একলা বেরিয়ে যাচ্ছিল—সামলানোর জন্য সঙ্গে যেতে হয়েছিল। একেবারে মিথ্যেও নয় সেটা।

বনমোরগের ডাক যেদিক থেকে আসে, জায়গার আন্দাজ করে রেখেছে। গাছে গাছে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, গর্ত আছে কোথায়। গাছের গর্তে মুরগি থাকে, ডিম পাড়ে সেখানে, ডিমে তা দেয়। গর্তে হাত ঢুকিয়ে মুরগি ধরা সেই অবস্থায় কঠিন হয় না।

গল্পে গল্পে ছটা সমস্ত জেনে নিয়েছে, যতীন বলেছে। বাদাবনের সব-কিছু যতীনের নখদর্পণে। তবু নিজে সে কখনো মুরগি ধরতে যায়নি। ডিম খাওয়ার লোভে গর্তে অনেক সময় সাপ ঢুকে যায়। সাপে যতীনের বড় ভয়।

সাপ থাকুক যাই থাকুক, কী করা যাবে—উপরমুখো চেয়ে চেয়ে ছটা বনে ঘুরছে, সন্দেহবশে উঠে পড়ছে কোন কোন গাছে। নিচে থেকে গর্তের মতোই দেখাচ্ছিল, আসলে কিছুই নয়—ঝড়ে ডাল ভেঙে গিয়ে ঐরকমটা হয়েছে।

পয়লা দিন বৃথা গেল। কায়দা বুঝে আবার একদিন বেরিয়েছে। ফিরে এসে যতীনের সঙ্গে ফিসফিসানি : একটা জিনিস এনেছি যতীন-দা। কাউকে বলবে না, দিব্যি করো!

কি জিনিস?

খাওয়ার জিনিস, দিব্যি করো আগে, তবে তো বলব।

খাওয়ার নামে যতীন সব করতে পারে। অজভিঁগ জঙ্গলে বছরের পর বছর পড়ে আছে দেদার মাছ খেতে পায় বলে। দিনকতক যতীন খুব জ্বরে ভুগেছিল। কখন জ্বর-বিচ্ছেদ হবে—কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঝিম হয়ে থাকত। ঘাম হয়ে তারপরে যে-ই গা জুড়াল, যতীন অমনি তড়াক করে উঠে এক কাঁসর ভাত নিয়ে বসত। যতীন বলে, কষ্ট করে যে প্রাণ ধরে আছি, সে কেবল ভালমন্দ খেতে পাব বলেই।

খাওয়ার জিনিস শুনে যতীন কালীর দিব্যি মহাদেবের দিব্যি লক্ষ্মীর দিব্যি কেষ্টঠাকুরের দিব্যি বনবিবির দিব্যি গাজি-কালুর দিব্যি—পটাপট ডজন-খানেক দিব্যি গেলে বলল, প্রাণ থাকতে কখনো ফাঁস করব না। বলো কোন্ জিনিস!

বনমুরগির ডিম এনে ছাইগাদায় ঢুকিয়ে রেখেছে। ছাই সরিয়ে ছটা যতীনকে দেখিয়ে দিল।

যতীন বলে, ডিম মুরগির তো বটে? সাপেরও ডিম হয়। সে ডিমে বিষ।

মুরগি ডিমের উপর বসে তা দিচ্ছিল। ইচ্ছে করলে মুরগিও ধরে আনতে পারতাম।

যতীন চুক চুক করে : আনলে না কেন?

ডিমে ডাকে না—তার জন্যেও তোমায় খোশামোদ করতে হচ্ছে। জলজ্যান্ত

মুরগিটা বাসায় এনে তুললে রক্ষে ছিল?

তা বটে!

প্রণিধান করে যতীন বলে, মুরগির গর্তটা আমায় দেখিয়ে দিও, জল আনবার মুখে আমি ধরে আনব। আমি আনলে দোষ হবে না।

শতকণ্ঠে ছুটার তারিপ করছে: ধন্যি মেয়ে বটে তুমি। এত সমস্ত খোঁজ-খবর রাখো। আমি এদ্দিন আছি, আমার কিন্তু খেয়ালে আসেনি।

রাত্রে খেয়েদেয়ে ছুটা ঘরে ঢুকেছে, বাইরে এসে যতীন—ছুটা ছুটা করে ডাকছে।

রাধিকা বলেন, ওকে কেন?

খাবার জল চেয়ে এসেছিল। নিয়ে এসেছি।

ডাহা মিথ্যে এসে বলল। ইঙ্গিত ছুটা বুঝেছে, তাড়াতাড়ি সে বাইরে এল। একজোড়া সিদ্ধ ডিম যতীন নিয়ে এসেছে। তাড়া দেয়: কোঁত কোঁত করে গিলে ফেল না—দেখছ কি? তারপরে জল খেয়ে নাও। কষ্ট করে এনেছি, না দিয়ে খেলে হজম হবে না। ধর্ম রাখি কি রকম, দেখ! আরও কিন্তু আনবে।

একটা ডিম যতীনকে ফেরত দিয়ে ছুটা বলল, মণিকেও ডেকে এমনি জল খাইয়ে এসো গে। ডিম তুমিই যেন এনেছ। আমার কথা টের পেলে তখুনি কিন্তু বলে দেবে।

কাঠ-কাটা গোলপাতা-কাটা মধু-ভাঙা জোংড়া-কুড়ুনোর নৌকোরা ঘাটে গেরাবি করে। শিকারী নৌকোও আসে মাঝে মধ্যে। বনরাজ্যে মানষেলার গন্ধ নিয়ে আসে এরা সব। পাশ নিয়ে বাদায় ঢুকবে, অনেক তার ঝামেলা—রাত্রি-বেলাটা, হয়তো বা পুরো দিন ও রাত্রি থেকেই যেতে হলো। যতীন এসে পলকে ভাব জমিয়ে ফেলে, ডাঙা অঞ্চলের কথা শোনে, নানান খবরাখবর নেয়, তাস-দাবা খেলে। গীতবাদ্যের মানুষ থাকে এক এক নৌকোয়, গান ও ঢোলকবাদ্য শোনা যায় সেদিন। ছুটাই বা হাত-পা কোলে করে ঊর্ধ্বলোক থেকে কাঁহাতক দেখে যাবে! নেমে গেল ফুড়ুত করে। টের পেয়ে রাধিকা আচ্ছা রকম বকাবকি লাগালেন।

মণিলালকে পেয়ে ছুটা বলল, তুইও গিয়েছিলি আমার সঙ্গে।

না তো—

গিয়েছিলি, জানিসনে—। চোখ টিপে দিল খুব কড়া করে।

মেয়ের পক্ষে মধুসূদন দাঁড়ালেন: জঙ্গলে পড়ে আছে ছেলেমানুষ, দেশ-ঘরের জন্যে মন আনচান করে। গাঁ-অঞ্চলের মানুষ দেখে আর থাকতে পারেনি। একলাও যায়নি—ছাত্রী-মাস্টার দু'জনে গিয়েছিল। দুটো-চারটে কথাবার্তা বলে

ফিরে এসেছে তো কি হয়েছে?

বাপের মত পেয়েছে, তা হলেও ছটা মায়ের চোখের সামনে দিয়ে কখনো জেটিতে নামে না, আড়াল করে যায়। মধু-কাটার পুরো মরশুম এখন—মধুর নৌকোর অঢেল আনাগোনা। এক বুড়ো মউল, সখারাম তার নাম, অসুখ হয়ে ঘাটে আটকা পড়ে গেছে। ডাক্তার-কবিরাজের অভাব বলে মধুসূদন 'গৃহচিকিৎসা' বই ও হোমিওপ্যাথি কৌটো রাখেন, বিপদে-আপদে কাজ দেয়। রোগ-লক্ষণ বলে বাবার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে ছটা সখারামকে খাইয়ে দিল, বার্লি রেঁধে দিয়ে এল। সখারাম গদ্‌গদ: বাদাবনের লক্ষ্মীঠাকরুনডি—নামডা কও দিনি তোমার!

ছটা হেসে বলে, নাম ইন্দুলেখা। দাঁত পড়ে গেছে—সে তোমার জিভে আসবে না। ছটা-ছটা করে সকলে।

সখারাম বলে, একটুখানি ভাল মধু তোমারে খাতি দিয়ে যাবো মা, সুভালা-ভালি যদি ফিরতি পারি।

কেন, না ফেরার কি হলো?

একফোঁটা ছটার কণ্ঠে প্রবীণার মতো ধমকের সুর। বলে, কুডাক ডাকছ কেন মুরুব্বিমশাই?

সখারাম বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে, খাসা যাচ্ছিলাম—মালে হাজির হয়ে এদ্দিন কাজে-কামে লাগি যাতাম। তা অব্যেঘাত কী রকম দেখ। দু-দুডো দিন পড়ে থাকলাম—আর বাড়ির মানুষ, বলতি গেলি, না-খেয়েই তো রয়েছে।

কেন, না-খেয়ে আছে কেন?

বাদাবনে মানুষ থাকতি, বাড়ির উনুন দিনমানে জ্বালা যায় না।

গল্পের গন্ধ পেয়ে ছটা পাটার উপরে জাবড়ে বসল। সখারাম মউলের মুখে শুনছে—মধু-কাটা শক্ত কাজ, অনিয়ম হলেই ঘাড় মটকাবে। বাদায় বেরিয়ে পুরুষদের পক্ষে ষোল-আনা নীতি-নিয়ম মানা সম্ভব নয়, ঘরে থেকে মেয়েরাই করে সে-সব। পরিচ্ছন্ন শুদ্ধাচারে থাকে—মা বনবিবির নামে পুজো দেয় নিত্যিদিন, মানত করে। রান্নাবান্না করে না—আগুনই দেবে না উনুনে। আগুনের ধোঁয়ায় বন নাকি ঝাপসা হয়ে যায়—গাছের উপরে এবং ডাইনে বাঁয়ে নজর ঠিকমতন পৌঁছয় না। মউলরা বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত এমনি। মধুর ভরা তারপরে একদিন গাঁয়ের ঘাটে লাগল, ঘরের-পুরুষ নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরেছে। চট করে অমনি যে নেমে পড়ল, সে হবে না। নিয়মের কাজকর্ম এখনও। বরণকুলো মাথায় করে মেয়েরা সব ঘাটে আসছে—গোড়ায় ডিঙা-বরণ। মধু ঘরে তোলা সকলের শেষে।

মৌপোক অর্থাৎ মৌমাছির ওড়া দেখে মউলের দল জায়গা পছন্দ করে নেয়। দুই গাঙ দুই দিকে—জায়গাটা এমনি হলে দু-পাশ দিয়ে বিপদের ঝুঁকি থাকে না। এর ভিতরেও ডাইনে বাঁয়ে একশ' দেড়শ' হাত নিয়ে এক-একজনের এলাকা। মৌপোক উড়ে যাচ্ছে, ছোটো তাকে অনুসরণ করে—দৃষ্টি উপরমুখো। নজর

বাইরে যেতে দেবে না মৌপোক থেকে। ছোটখাট খাল পড়েছে—ভ্রূক্ষেপ নেই, ঝপ্‌পাস করে পড়ল লাফিয়ে খালের মধ্যে। শূলোর গুঁতো খাচ্ছে, পা রক্তাক্ত—পায়ের দিকে এখন কে তাকাতে যাবে? মৌপোক নজর থেকে যেন না হারায়। কোন্‌ গাছে গিয়ে বসে দেখ—চাক সেইখানে।

মউলের নজর উপর-আকাশে এবং উঁচু ডালপালায়, মাটির দিকে দেখে না। ছুটন্ত মউল দেখলে বাঘ ঠিক পিছু নেবে, তাক মতন ঘাড়ের উপর পড়বে। মুখে নিয়ে বন-জঙ্গল ভেঙে দে-ছুট। মানুষটা আর নেই—রক্তের দাগ ঝোপ-ঝাপের উপর।

জোংড়া-খোঁটাদেরও ঘটে এমনি মা-বনবিবি নিদয়া হলে। ছটা একদিন অফিসের বারান্ডা থেকে একটা জোংড়া-খোঁটা দল দেখেছিল। তারা অবশ্য ভালোয় ভালোয় নৌকো ভরতি করে হেলতে দুলতে চলে গেল। দেখতে বেশ লাগে। ভাঁটা সরে গিয়ে চর জেগেছে। গাঙের জল অনেকখানি দূরে, বাদার জঙ্গলও দূরবর্তী। জল আর জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে প্রশস্ত এক সড়ক যেন। পরিচ্ছন্ন সমতল—ভোঁ-ও-ও করে পুরো দমে মোটরগাড়ি ছুটিয়ে দেওয়া যায় জায়গার উপর দিয়ে। দেখতেই শুধু ঐ রকম—ছটা ভাল মতন বুঝেছে মণি-লালের সঙ্গে পাঁচিলের বাইরে বেরিয়েছিল যেদিন। নোনা কাদা ওর নাম—এক ছিটে গায়ে লেগেছে তো ধুয়ে ফেলতে পুরো কলসি জল লাগবে।

চরের এখানে ওখানে গাঢ় হলুদ রঙের অজস্র ফুল ছড়ানো। রেলিঙে ঝুঁকে ছটা দেখছে। না, ফুল হবে কেন? ঝপাঝপ দাঁড় বেয়ে একটা নৌকো ঘাটের দিকে আসছে—কাছাকাছি ফুলগুলো চকিতে অমনি মাটির তলে ঢোকে। ফুল নয়, ক্ষুদে ক্ষুদে এক ঠ্যাং-ওয়ালা কাঁকড়া। খাওয়া চলে না, কোন রকম কাজে আসে না—ভাঁটা সরে-যাওয়া চরের উপর শোভা বিস্তার করে থাকে শুধু।

বাঁকের মুখে লাইনবন্দী মানুষ—জোংড়া খুঁটছে। জোংড়াও শামুক, গাজরের আকৃতি। জোয়ার-জলে অজস্র জোংড়া ভেসে আসে, পড়ে থাকে চরের উপর। ঝুড়ি নিয়ে কুড়োতে কুড়োতে জোংড়া-খোঁটারা এদিকে আসছে। কাছাকাছি এসে পড়ল। একটা ডিঙির খোলে ঢেলে দিয়ে আসে, এসে আবার খোঁটে। ভরা ডিঙি তারপরে গঞ্জে নিয়ে খালাস করে, চুনুরিরা পুড়িয়ে বাখারি-চুন বানায়। সারা বাদাবন জুড়ে মা-বনবিবি কত জিনিস ছড়িয়ে রাখেন, কুড়িয়ে নিলেই হলো। একেবারে মুফতে নয় অবশ্য, রাজার রাজভাগ কিছু আদায় দিতে হয়। তারই জন্যে মধুসূদনরা অফিস সাজিয়ে তক্কে-তক্কে থাকেন।

জোংড়ার কাজেও বিপদ খুব, সখারাম বলেছিল। দলটা তো জোংড়া খুঁজে খুঁজে এগোচ্ছে। পাঁচ-সাত জোড়া উপাদেয় খাদ্য ফাঁকার মধ্যে ঘুরঘুর করছে—জঙ্গলে নাম-করতে-নেই সেই-তিনি ওত পেতে দেখছেন, মুখে লালা ঝরছে, আর অল্প অল্প লেজের বাড়ি দিচ্ছেন মাটির উপর। দু-পেয়ে জীবকে সবাই ভয় করে—সুনিশ্চিত না হয়ে ঘাটা দেবেন না তিনি। এক জায়গায় কাদা গভীর

—পা ফেলে টেনে তোলা মুশকিল। এমনি অবস্থায় কেউ হয়তো লাইন ভেঙে পিছিয়ে পড়েছে। আর যাবে কোথা—চিলে ছোঁ দেওয়ার মতন আচমকা সেই মানুষটার উপর! হুঙ্কার শুনে সবাই পালাচ্ছে, প্রাণভয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাকটা ঠিক কার উপরে মালুম হচ্ছে না—সবাই ভাবছে আমার উপরে বুঝি! পিছনের মানুষটি কখন উধাও হয়ে গেছে—ডিঙিতে উঠে তবে ঠাহর হলো।

সখারামদের কাজ-কাম ভাল হয়নি, মন বিষণ্ণ। তবু বুড়ো জেদ ধরেছে, স্টেশনে ঘুরে মধু দিয়ে যাবে। যৎসামান্য, এই ধরো ঘটিখানেক--কিন্তু খলসি-ফুলের মধু, অতিশয় সরেস বস্তু, ছটার নামে আলাদা করে রাখা।

অন্যেরা আড় হয়ে পড়ল : কোটালের টান। খরস্রোতে কুটোগাছটি ফেললে দু-খন্ড হয়ে যাচ্ছে। তায় ঘুরকুট্টি অন্ধকার। হেন অবস্থায় তিন গাঙের মোহানায় নৌকো বেকায়দায় খান খান হতে পারে।

বুড়ো মুরুব্বিকে তবু বোঝানো গেল না। রাত ঝিম ঝিম করছে, হুড়ুম-হাড়াম করে ঢেউ আছড়ে পড়ছে জেটির উপর। মধুর নৌকো লাগাতেই হলো ঘাটে।

সকালবেলা ছটা ঘুম ভেঙে উঠতে রাধিকা বললেন, রাত দুপুরে এক নৌকো এসে তোকে ডাকাডাকি করছিল। পোকের রস দিয়ে গেছে তোর নাম করে।

কি দিয়ে গেছে মা?

পোকের রস।

মেয়ে অবাক হয়ে আছে দেখে রাধিকা সৈরভীকে বললেন, বুঝিয়ে দে না, আমি তো নাম করতে পারিনে।

সৈরভী বলে, মধু দিয়ে গেছে। মধু মা কেমন করে বলবে? কর্তার নাম যে ঐ।

ছটা বলে, কেন, বললে কি হয়?

সৈরভী বলল, শ্বশুর-ভাশুর-সোয়ামির নাম ধরতে নেই। তোমার বরের তুমি নাম ধরে ডেকো দিদি। সেকেলে মানুষ ওঁদের মুখে আসবে না।

মধু হয়ে গেল পোকের রস। হি-হি-হি—

হেসে হেসে খুন হচ্ছে ছটা। বলে, মজার নাম বের করেছে মা—পোকের-রস।

প্রথম রাত্রে ছটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল--গাঙ ঘরের মধ্যে চলে এল নাকি? তারপরে ব্যাপারটা বুঝেছে। আসে গাঙ নিত্যিদিন, নিত্যি রাতে—ঘরের মধ্যে নয়, ঘরের নিচে। মোটা মোটা শাল-সুঁদুরের খুঁটির উপরে ঘরবাড়ি, তক্তার পাটলাচ করা মেজে। মেজের তলে ফাঁকা। জেটিতে নেমে ছটা ঐ পাতালতলে

উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখেছে। উপরতলায় তারা সব কাজকর্ম করছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, কিংবা ফতর-ফতর করে নাক ডাকছে, নিচে সেই সময়টা জোয়ার-জলে তুফান উঠছে অথবা ভাঁটা সরে গিয়ে তাদের মুলটির বাড়ির গোবর-মাটি নিকানো আঙিনার মতন হয়েছে। ভাবতে বেশ মজা লাগে—তাই না?

জরুরী ডাক পেয়ে মধুসূদন সদরে গেছেন। তিন দিন আজ স্টেশন-ছাড়া। আর, বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর্—ফরেস্টার বিহনে অফিস খাঁ-খাঁ করছে। একটা মানুষ দেখা যায় না কোনোদিকে।

ভাদ্রমাস। ছড়া-ছড়া বৃষ্টি, তক্ষুনি আবার রোদ চিকচিক করে ভিজে ডালপালার উপর। কাঁদতে কাঁদতে বনশিশুরা চোখ না মুছেই যেন হেসে উঠল। মণিলাল অনেকদিন বাড়ি ফিরে গেছে। ছটার একা একা ভাল লাগছে না, রেলিং ঝুঁকে মোহানার দিকে চেয়ে আছে। গাঙের জলে কখনো রোদ, কখনো মেঘ-ছায়া। দূরে এক জেলেডিঙি দেখা যায়। মুখোড় বাতাস পিঠেন স্রোত, লড়ালড়ি লেগে গেছে জলে ও বাতাসে—ডিঙি পড়বি তো পড় ওদের ঐ ধুন্দুমারের মধ্যে। আর যাবে কোথা! দু'পক্ষের যত আক্রোশ সামান্য ডিঙিটার উপর গিয়ে পড়ে। ঝুঁটি ধরে যেন নাড়া দিচ্ছে : আসবি আর এখানে—আসবি? মণিলালের সঙ্গে জঙ্গলে বেরুনোর ব্যাপারে মধুসূদন যেমন ছটার ঝুঁটি ধরেছিলেন। মার খাওয়ার পরে যে প্রাপ্তিটা ঘটে তা-ও ছটা পেয়ে গেছে। নতুন ধরনের পোশাকের সেট—শালোয়ার-কামিজ।

ভ্রূ উলটে রাধিকা বলেছিলেন, মেয়ে এই আজব পোশাক পরে বেড়াবে নাকি? কী ঘেন্না!

মধুসূদন বললেন, সাহেবের মেয়েটা পরে। খাসা দেখায়। তাই দেখে কিনে ফেললাম।

তাদের মানাতে পারে। তাই বলে তোমার মেয়ে?

সে মেয়ে কটকটে কালো। তাকে যদি মানায়, আমার ফরসা মেয়েরই বা বেমানান হবে কেন?

রাধিকা অন্য দিক দিয়ে গেলেন : তা জঙ্গলে পরে দেখাবে কাকে?

দেশে-ঘরে গিয়ে পরবে।

একটা গুহ্যকথা মধুসূদন ঝোঁকের মাথায় বলে ফেললেন : বাদার অন্ন কদ্দিন আর ভোগে আছে জানিনে। মুখুজ্জের কথাবার্তা আজকাল যেন কেমন-কেমন! তার মানে কোটনারা কান ভারী করেছে তাঁর।

॥ আট ॥

জেলেডিঙির দুর্গতি দেখছিল ছটা বারান্দায়। যায়-যায় অবস্থা। না, ঢেউয়ের কবল কেটে বেরিয়ে এল অনেক কষ্টে। ঝপাঝপ ঝপাঝপ তিন-চারটা হাতে বোঠে মারছে। দৌড়—দৌড়—

নতুন পোশাকের কথা এই সময়টা মনে পড়ে গেল। শূন্য ঘরে, এখন মুখ বাঁকানোর কেউ নেই—জিনিসটা পরে আয়নায় ঘুরে ফিরে দেখবে, বাহার খেলে কি রকম!

ভেজানো দরজা খুলে ঘরে পা দিয়েই চমকে উঠল। একা-একা লাগছিল—মানুষ যে কত! রীতিমত তাগতওয়ালা সব মানুষ। ঘোর বিক্রমে চেঁচাচ্ছে, পেটাচ্ছেও দমাদ্দম। ঘরের ভিতরে নয়, ঘরের নিচে। ঘরের নিচে যে পাতালপুরী, লড়ালড়ি সেখানে লেগে গেছে, কাঠের মেজে ফুঁড়ে অল্পস্বল্প কানে আসছে। যেটুকু আসছে, তাতেই তাজ্জব।

ছটা কানের পাশে আড়াআড়ি হাত রেখে আসনপিঁড়ি হয়ে বসল, তারপর শুয়েই পড়ল কাত হয়ে মেঝের উপর কান রেখে। জুত হচ্ছে না। হঠাৎ এক অদ্ভুত সমাধান বেরিয়ে গেল, আলাদিন হঠাৎ যেমন গুপ্তদরজা খোলার মন্ত্র পেয়ে গিয়েছিল। বড় বড় কড়ির উপরে তক্তার টুকরো ইস্কুপে এঁটে মেজে বানিয়েছে। একটা ইস্কুপ কেমন ঢলঢলে—নোনা জলবাতাসে মরচে ধরে লোহা ক্ষয়ে গেছে। ইস্কুপ খুলে গেল অল্প চেষ্টাতেই, মোচড় দিতে তক্তাটুকুও উঠে এল। সামান্য একটু ফাঁক হয়েছে—তক্তাটা বসিয়ে দিলেই ফাঁক ভরাট হবে আবার, কেউ কিছু জানতে পারবে না। ভাল হলো—কান শুধু নয়, দৃষ্টিও চলবে এবার নিচে।

নিচে নৌকো এনে বেঁধেছে, নাইয়াদের মধ্যে কলহ। হাঁড়িতে জল চাপিয়ে চাল ছাড়তে গিয়ে দেখেছে, কলসিতে মুঠো কয়েক মাত্র আছে। সজনেখালির নিচে দিয়ে এসেছে, চাল কেনার তবু হুঁশ হলো না। যে ছোঁড়া রান্না করে, ক্ষিধের মাথায় দারুণ ক্রোধে সবাই তার উপর গজরাচ্ছে। এবং গর্জনেই শোধ যায়নি, বর্ষণও কিছু ঘটেছে।

ছটাকে মজায় পেয়ে গেল। চালের হাঁড়া এই ঘরেই—ন্যাকড়ায় কিছু চাল বেঁধে টুপ করে তক্তার ফাঁক দিয়ে ফেলে দিল। পড়েছে ঠিক জায়গাতেই—তোলা-উনুনের পাশে। তক্তা যথাস্থানে বসিয়ে মুহূর্তে ফাঁক মেরে দিল। উপরে তাকিয়ে কোন-কিছুর হদিস পাবে না। নাইয়ারা কি ভাবছে—বনের পাটরানী বনবিবি শাড়ির ন্যাকড়ায় চাল বেঁধে ছুঁড়ে দিয়েছেন মানুষগুলো উপোসী

যায় দেখে? ভাবে ছটা এইসব, আর আপন মনে হাসে।

মণিলাল চলে যাওয়া থেকে ফাঁকা-ফাঁকা লাগত, দিব্যি একটা কাজ পাওয়া গেল। অধোলোক চেয়ে চেয়ে দেখা। নতুন এক জগৎ-আবিষ্কার। ভগবান নাকি অদৃশ্য ঊর্ধ্বলোক থেকে তাবৎ পৃথিবীতে নজর ফেলেন। ছটারও হুবহু তাই—উপর থেকে দেখে সমস্ত। জোগার গোনে জোয়ার জলে নিচেটা ভরে যায়, জল এক এক সময় মেজের কাছাকাছি এসে পড়ে। শুয়ে তখন ছিদ্রপথে হাত ঝুলিয়ে দিলে হাত বোধহয় জলে গিয়ে পৌঁছবে। তফরা ওঠে সেই জলের উপর। একদিন বেশ বড় মাছে ঘাই মেরেছিল। বঁড়শিতে টোপ গেঁথে যদি নামিয়ে দেওয়া যায় নির্ঘাৎ মাছ গাঁথবে, ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে মাছের যোগাড় হয়ে যাবে।

যতীনকে বলেওছিল, সুতো-বঁড়শি এনে দাও যতীনদা, তোমাদের মাছ মেরে খাওয়াব। কায়দাটা অবশ্য বলেনি। যতীন কানেও নিল না। বলে, মাছের অভাব আছে নাকি যে তোমায় মাছ মেরে খাওয়াতে হবে?

খাওয়াটাই বোঝে শুধু যতীন—মাছ খাওয়ার চেয়ে মাছ মারায় যে বেশি সুখ, সে ওর মাথায় ঢুকবে না।

জোয়ারে এই, ভাঁটায় ভিন্ন চেহারা। বনের বাসিন্দা কিছু কিছু বেড়াতে আসে সেই সময়। দুশমন দু-পেয়ে জীব ঠিক মাথার উপরে, বুঝবে কেমন করে? শুয়োর এসে ঘোঁত ঘোঁত করে ঘোরে, কাদায় মুখ ঢুকিয়ে লাঙ্গল চষার মতন করে কী যেন খোঁজে। খরগোস আসে, এক লহমা কান খাড়া করে থেকে তারপর চোঁচা দৌড়। একদিন হরিণ এল পাঁচ-সাতটা—বনভোজনের মেজাজ। জোয়ারের তোড়ে ডুবন্ত গাছগাছালির পাতা ছিঁড়েখুঁড়ে পড়ে, ভাঁটার স্রোত তারপরে ঝাঁটপাট দিয়ে সমস্ত সাফ-সাফাই করে দিয়ে যায়—বাদাবনের এই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এ জায়গায় তা হয়ে ওঠে না—সারবন্দি খুঁটিগুলোর গায়ে লতাপাতা কিছু কিছু আটকে থাকে, হরিণ এসে মজাসে খুঁটে খুঁটে খায়।

নৌকোর মাল্লাদের চাল দিয়েছিলাম, রোসো, তোমাদেরও দেবো—ছটা মনে মনে ঠিক করল।

উঠোনের কেওড়াগাছ থেকে কিছু কচিপাতা পেড়ে রেখে দিল। আবার একদিন হরিণ এসেছে, ফুটো দিয়ে আলগাছে কেওড়াপাতা ফেলবে—হরিণ মানুষের মতন হাঁদা নয়, অনেক বেশি সতর্ক। শব্দ একটু হয়েছে কি না-হয়েছে —দে ছুট। পলকে অদৃশ্য।

হরিণদের কাছে ছটার ভগবান হওয়া ঘটল না।

মশা খুব এই বর্ষার সময়টা। সন্ধ্যা হতে না হতে বন থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে গায়ে পড়ে, গান শোনায়। ধুনোর ধোঁয়ায় মানায় না। ছটারা মশারির মধ্যে

ঢুকে পড়ে।

মধুসূদন বলেন, দশটা-পাঁচটার অফিস নয় আমার—আমি কি করি? রাত্রে যখন কাজ পড়ে, দু-পাশে দুই ধুনুচি রেখেও রক্ষে হয় না। হাতে কলম ধরবেন কি—দুটো হাতেই সারাক্ষণ গায়ে চাপড় মারতে হয়।

ছটাকে যতীন বলল, মশার চোটে হরিণও বনে থাকতে পারে না। খানিকটা রাত্রি হলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িও, জেটির কাছাকাছি সব আসবে, দেখো।

সত্যি? তিড়িং করে ছটা লাফিয়ে ওঠে: ঠিক বলছ যতীনদা?

উৎসাহ পরক্ষণে মিইয়ে যায়: যা মশা, দাঁড়াব কি করে?

যতীন বলে, ফাঁকায় মশা না। হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়। মশা নেই বলেই তো হরিণ আসে।

যতীন বারান্দায় শোয়, যথারীতি মাদুর পেতে পড়েছে। এখন হরিণ-খরগোস কাঁক-করমকুলি প্রমুখ যাবতীয় পশুপাখিরা মিছিল করে চরে আসুক না—যতীনের কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই। তবে হ্যাঁ, মারতে পারো যদি, তখন সে নিশ্চয় আছে। মশলাপাতি সহযোগে জুত করে পাক করবে। এবং বড় এক বাটি সরিয়ে রেখে দেবে আগামীকালের জন্য। মাদুরে পড়া মাত্রই যতীন চোখ বুজেছে।

অধীর হয়ে ছটা বলে, আসে কই হরিণ?

ঘুমের মধ্যেই যতীন জবাব দেয়: টুঁ শব্দটি নয়। শব্দ হলেই পালাবে। ঝিম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো।

দাঁড়িয়েই আছে ছটা অতএব। পূর্ণিমার রাত। সারা দিনমান বৃষ্টি হয়ে আকাশের সব মেঘ ফুরিয়ে গেছে, ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। ছায়া-ছায়া ওদিকটা ঐ যে—ভুল হয়ে যায়, বাদা ছেড়ে বুঝি গ্রামে ফিরে গেছে। আম-জাম পেয়ারা-কাঁঠাল নারকেল-সুপারির বাগবাগিচা, ভিতরে ভিতরে গৃহস্থের ঘরবাড়িও আছে বোধহয়। মরা-ভাঁটায় গাঙ এখন দূরে গিয়ে পড়েছে—পুকুরের মতন নিথর জল। নতুন বিয়ের বউ হয়ে গিয়ে ডানপিটে মেয়েটা হঠাৎ নরম-সরম হয়ে যায়—গাঙের গতিক সেইরকম। জল পড়ার ক্ষীণ আওয়াজ জঙ্গলের ভিতর দিকে। গাছের উপরে রাত্রিচর পাখীর পাখার ঝাপটানি—

হরিণই বটে, বনের প্রান্তসীমায় জ্যোৎস্না-ঢালা চরের উপর। ছোট-বড় মিশিয়ে দিব্যি একটা দল ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে। বাচ্চাগুলো মা-হরিণের গায়ে গায়ে লেপটে আছে যেন। একটা নিচু ডাল মুখ দিয়ে টেনে মা দাঁড়িয়ে পড়ল। বাচ্চা মুখ তুলেছে, নাগাল পাচ্ছে না। ডাল টেনে আরও নামিয়ে মা বাচ্চার একেবারে মুখের উপর এনে ধরল। খুঁটে খুঁটে আরাম করে পাতা খাচ্ছে সেই বাচ্চা। খাওয়া হয়ে গেল তো ডাল ছেড়ে দিল মা-হরিণ—ডাল সড়াক করে উপরে উঠে গেল। মা আর বাচ্চা এবারে দূরের দিকে চলল জুত মতন আর একটা ডালের খোঁজে নিশ্চয়। ছটা নজর ধরে আছে, এই দুটিকে নজরের বাইরে যেতে দেবে না।

সমস্ত মাটি। কোন্ দিক থেকে বন্দুকের আওয়াজ। চর ফাঁকা চক্ষের নিমিষে, হরিণ নেই। ঘুম ভেঙে যতীন তড়াক করে উঠে দাঁড়াল : পড়ল নাকি রে?

বাওন-শিকার—যতীন ধরে নিয়েছে, ফলাফল জিজ্ঞাসা করছে। ছটা চুপ করে থাকে, জবাব দেয় না। আষাঢ়ের গোড়ার দিকে সাতকড়ি একদিন খুব তোড়জোড় করে বাওন-শিকারে বেরিয়েছিল। ডিঙি-নৌকো, আট-ব্যাটারির জোরালো টর্চ—বন্দুক তো আছেই। বাওনের এমনি মজা, বন্দুকের অভাবে শড়কি-বর্শা দিয়েও কাজ হাসিল করা যায়—সাতকড়ি দেমাক করে বলত। নিজে কিন্তু সেদিন অর্ধেক রাত ছুটোছুটি করে একেবারে শূন্যহাতে ফিরেছিল। আলো নাকি ঠিক মতো ফেলতে পারেনি। ভাগ্যিস পারেনি জেঠা—ছটা বিষম খুশি। ভালমানুষ হরিণেরা আপন সুখে চরে বেড়াচ্ছে—টর্চ আচমকা চোখের উপর গিয়ে পড়ে। তীব্র তীক্ষ্ম আলো ইস্পাতের তারের মতন চোখের মণি দুটো বিঁধে ফেলে শিকারকে টেনে ধরে আছে। ডিঙি আস্তে আস্তে পাড়ের দিকে যাচ্ছে, টর্চ ধরা আছে ঠিক মতো। আলো সামান্য এদিক-সেদিক হলেই হরিণ পালাবে।

যতীন চারিদিক ঠাহর করে হতাশ হয়ে বলল, কিছু পড়ে থাকে তো অনেক দূরে, হাটগাছার ওদিকে। ধুস! আমি ভাবলাম ঘাটের নিচে আমাদের কালী নস্করের দেওড়।

সদর থেকে মধুসূদন বেজার মুখে ফিরলেন। বদলি করেছে। সেই খোশ-খবর স্বমুখে দেবার জন্য মুখুজ্জে সাহেব ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

কর্তা-গিন্নিতে কথা হচ্ছে। মধুসূদন বলছেন, তদবিরে খামতি ছিল, বুঝতে পারছি। তা সাঙ্গোপাঙ্গদের দিয়ে জানিয়ে দিলেই পারত। বাঘের দুধ চাইলেও জঙ্গলের বাঘ দুয়ে হুজুরে ভেট দিয়ে আসতাম।

রাধিকা শুধালেন : কোথায় পাঠাচ্ছে?

চুমকুড়ি বলে গাঙ আছে না—সেই তল্লাটে ঘের পড়েছে, কুপ-অফিস বানিয়েছে—

বাদায় যত্রতত্র গাছ কাটা মানা—এলাকা বাছাই করে ঘের দিয়ে দেয়। ঘেরের মধ্যেও আবার গাছ বাছাই—গাছের গায়ে মার্কামারা। শুধুমাত্র সেই সেই গাছে কুড়ুল পড়বে। ঘোর জঙ্গলে এর জন্য অস্থায়ী অফিস বসে, কুপ-অফিস বলে তাকে। মানুষের মুখ দেখা যায় না, কিছু কিছু কাঠুরে ছাড়া। গাছগাছালি পাখপাখালি আর জন্তু-জানোয়ারদের নিয়ে ঘরবসত। মধুসূদনকে এমনি এক জায়গায় যেতে হচ্ছে।

রাধিকা রায় দিলেন : চাকরি ছাড়ো।

অবোধ মেয়েমানুষের দিকে মধুসূদন তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকালেন। বলেন, মুখুজ্জে-শালা চাচ্ছেও তাই। দিব্যি মাছে-ভাতে আছি, দেখে মানুষের

চোখ টাটায়, আমার নামে লাগানি-ভাঙ্গানি করে। মুখুজ্জে তাইতে বিষনজরে দেখছে—এত লোক থাকতে আমার উপর অজঙ্গি জঙ্গলে যাবার হুকুম।

বলতে বলতে গর্জে উঠলেন: আমিও সহজ পাত্র নই। কত ধানে কত চাল—হন্দ-মুন্দ না দেখে ছাড়ব না।

রাধিকা সভয়ে বলেন, কাজ নেই। নোনা জল খেয়ে বাঘ-কুমিরের মুখে কতদিন আর পড়ে থাকবে? চাকরি ছেড়ে বাড়ি চলো—দুবেলা খাচ্ছি, না হয় একবেলা করে খাব। উপরওয়ালার সঙ্গে লড়ালড়ি করতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়ে যাবে।

মধুসূদন সবিস্ময়ে বলেন, ওপরওয়ালার সঙ্গে কি? লড়ালড়ি যতকিছু কোটনা ঐ সাতকড়েটার সঙ্গে। আমি বিদেয় হলে তার পোয়া-বারো—প্রোমোশন আদায় করবে ভেবেছে। গণ্ডগোলের মূলে সে রয়েছে নিমকহারামটাকে জব্দ আমি করবই। আমি ফরেস্টার, সে এক পুঁচকে গার্ড। তেল মাখাচ্ছে মুখুজ্জেকে—কতটুকু ক্ষমতা, মাখাচ্ছে সে কটু ভেরেণ্ডার তেল। আর আমি মধ্যমনারায়ণ মাখাব। মা-বনবিবির আশীর্বাদ নিয়ে আবার এক জবর স্টেশনে যাব, জমিয়ে সংসারধর্ম করব সবসুদ্ধ নিয়ে।

রাধিকা বললেন, মেয়ে সেয়ানা হচ্ছে—বিয়েথাওয়া দিতে হবে না?

উদাসীন কণ্ঠে মধুসূদন বললেন, দাও না—

রাধিকা জ্বলে উঠলেন: জঙ্গলের শুয়োর বাঁদর যা-হোক কিছু ধরে এনে তবে জামাই করো। মানুষ-জামাই কোথায় এখানে?

ছটা এসে পড়ল এই সময়। নতুন জায়গার নামে লাফালাফি জুড়ে দিয়েছে। বলে, কবে যাবে বাবা সেখানে—কবে?

সামনের মাস-পয়লা থেকে। পঁচিশ দিন আর আছে।

কী মজা, কী মজা—! দু-হাতে ছটা তালি দিয়ে ওঠে।

মধুসূদন বললেন, বেল পাকলে কাকের কি? মুলটিতে তোদের রেখে আসছি। কূপ-অফিসে একখানা নড়বড়ে টিনের ঘর শুধু—খাওয়া-শোওয়া-অফিস সমস্ত তার মধ্যে। ঘেরের গাছগুলো কাটা হয়ে গেলে তখনও যদি ধড়ে প্রাণ নিয়ে টিকে থাকি—ডেরাডাণ্ডা তুলে ছোটো আর এক বনে, নতুন যেখানে ঘের দিয়েছে।

বাড়ি ফেরা -কতদূরের সেই মুলটি! ভেবেচিন্তে মধুসূদন ডিঙিই ঠিক করলেন। গাঁয়ের বিল এখন জলে টইটম্বুর। ডিঙি হলে একেবারে বাড়ির পাশে বাগের নিচে নিয়ে বাঁধবে, ডাক দিলে বাড়ির লোক হৈ-হৈ করে এসে যাবে—কাটাখালি নেমে গরুর-গাড়ির হাঙ্গামা করতে হবে না। আরও ভাল, জুড়ন মাঝিকে পাওয়া গেল। অমন মাঝি বাদা অঞ্চলে দ্বিতীয় নেই। জুড়নের হাতে বোঠে দিয়ে, ডিঙি কেন, কলার ভেলাতেও অকূল দরিয়া পাড়ি দেওয়া যায়।

॥ নয় ॥

জোয়ারে ডিঙি ছাড়ল। বিদায়, বিদায়!

ছটার চোখ ছলছল করছে। দেখতে দেখতে কতকাল কেটে গেছে। পশু-পাখি গাছপালা নদীখালেরা সব পড়শি। অন্য কাজ না থাকায় এদেরই দেখত ছটা তাকিয়ে তাকিয়ে। অন্য কেউ না থাকাতে ডেকে ডেকে কথাবার্তা বলত। ওরাও জবাব দিত মনে হয়—ঠারেঠোরে আকারে-ইঙ্গিতে। আকাশের নিচে গাঙের চরে, বনের ধারে খেলা ওদের নিত্যিদিন চলবে, ছটা নামের মেয়েটা বারান্ডায় ঝুঁকে আর দাঁড়িয়ে থাকবে না।

বাঁকের আড়ালে ফরেস্ট-স্টেশন আস্তে আস্তে আড়াল হয়ে গেল। ছটা ছইয়ের উপর। রাধিকা হাঁক পাড়ছেন : গড়িয়ে পড়বি রে, নেমে আয়। গোল-পাতার ছই—পানসির ছইয়ের মতন চওড়াও নয়, সরু গোলাকার, গড়িয়ে পড়া অসম্ভব নয়।

কিন্তু হিতকথা কানে নেবে ও-মেয়ে! তর্ক করে : পড়ি তো সাঁতরে উঠব আবার।

সৈরভী বলে, আপিসের পুষ্করিণী নয় খুকি, কুমিরে কামটে বোঝাই।

ছটা দেমাক করে : সাঁতরে তারা আমার সঙ্গে পারবে? সে আর হতে হয় না।

ছইয়ের বাইরে মধুসূদন, তিনি তাকিয়ে দেখলেন। পড়ার মেয়ে নয়—ছইয়ের গায়ে জোঁকের মতন এঁটে আছে।

রাধিকা স্বামীর উপর ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন : তুমি তো কিছু বলবে না, মুখে ছিপি এঁটে আছ। পড়ে গেলে তখন কি হবে?

বলছি, বলছি—

নড়েচড়ে ভাল হয়ে বসে মধুসূদন বলেন, নেমে আয় ছটা। পড়ে গেলে বুঝবি তখন!

রাধিকা রাগ করে উঠলেন : অমন বলা বলতে হবে না তোমায়। তোমরা যদি কড়া হতে, মেয়ে এমন বাঁদর হতে পারে?

মেয়ে সেই সময়ে চেঁচিয়ে উঠল : দেখ দেখ বাবা, বাঁদর—

মধুসূদন রঙ্গ করে বলেন, আবার কোথায়? একটা তো ছইয়ের উপরে দেখছি।

ছটা বলছে, কত বাঁদর—উঃ! না দাঁড়ালে দেখবে কি করে? ছই ধরে দাঁড়াও, পড়বে না।

গাছপালাহীন খানিকটা ফাঁকা জায়গা—বানরে হুটোপাটি করছে সেখানে। মধুসূদন দেখে বললেন, মেকোকাঁকড়া ডাঙায় উঠছে, ধরে ধরে খাচ্ছে স্ফূর্তি করে। জলে নেমে ঢেউ দিচ্ছে দেখ কেমন—ঢেউয়ের সঙ্গে আরও যাতে কাঁকড়া উঠে পড়ে।

দেখার জিনিসই বটে! মাছ ধরার এক একটা গোনে মানুষদের যেমন দেখা যায়। এদের ঝক্কিঝামেলা নেই—ধরো, মারো, মুখে চালান করো। টের পেয়ে আরও সব বানর ছুটোছুটি করে বন থেকে বেরুচ্ছে। ভিড়টা বেশি রকম হয়ে যাওয়ায় কাড়াকাড়ি লেগে গেল এবার। হতে হতে মারামারি। পরাজিত কয়েকটা অল্প দূরে সরে গিয়ে দাঁত খিঁচোচ্ছে।

ছটা বলে, রাম-অনুচর ওরা—নিরামিষ কলাটা-মুলোটা খায় জানতাম। মাছও খায়?

মধুসূদন বললেন, বাদাবনে খাচ্ছে পেটের দায়ে। ক্ষিধের মুখে ভটচাজ্জিপনা চলে না। বাঁদর তো বাঁদর—বাঘে চুনোমাছ ধরে ধরে খাচ্ছে দেখেছি আমি। পেটের ক্ষিধে এমনি জিনিস।

মধুসূদন স্বচক্ষে না-ও দেখতে পারেন, তবে ভাঁটার উজানে বাঘে মাছ ধরতে ধরতে যাচ্ছে—কাঠুরে-বাওয়ালি অনেকেই দেখে থাকে। ধরেই অমনি খায় না, কচ করে কামড় দিয়ে ফেলে দেয় পাড়ের দিকে। ফেলতে ফেলতে এগুচ্ছে। চালাক কি রকম বুঝুন! ধরেই সঙ্গে সঙ্গে খেতে গেলে সময় যাবে, টানের মুখে ততক্ষণে মাছ কিছু পালাবে—সে জিনিস হতে দেবে না। মেরে মেরে ফেলে যাচ্ছে—খাল ধরেই আবার ফিরবে, কুড়িয়ে মউজ করে খেতে খেতে আসবে তখন। রসদের বন্দোবস্তটা আগে, খাওয়া পরে—ধীরেসুস্থে।

যতীনও যাচ্ছে। কয়েকটা দিন বাড়ি ঘুরে আসবে। তারও বাড়ি ঐ অঞ্চলে—কাটাখালি নেমে চলে যাবে—মধুসূদনের সঙ্গে বাদায় ফিরবে আবার আগ-নৌকোয় বোঠে বেয়ে দিচ্ছে সে।

বেলা পড়ে এসেছে, ছইয়ের তলে ঢুকে মধুসূদন এবার একটু গড়িয়ে নিচ্ছেন। মচমচানি আওয়াজ তুলে হেলেদুলে ডিঙি চলেছে।

ছটা হঠাৎ নেমে এসে বাপের গা ঝাঁকায়: মেঘ করেছে—বাবা। দ্যাখসে—

এ অপরূপ জিনিস বাপকে না দেখিয়ে সুখ হয় না বাপ-সোহাগি মেয়ের। টেনে তুলে বাইরে নিয়ে গেল। পশ্চিমা মেঘ ছুটে আসছে—সেই সঙ্গে আকাশ-জোড়া এক ধরনের গোঙানি। দেখতে দেখতে মেঘ সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। বিকালবেলাতেই ঘুরঘুট্টি আঁধার। গাঙের জল কালো। সকল দৃষ্টি পুঞ্জিত করেও ও-পার এখন নজরে আসে না, মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কাছের এই তীরে বন—বন কে বলবে, নীরন্ধ্র এক কালো যবনিকা।

ও জুড়ন!

ডেকে মধুসূদন কিছু উপদেশ দিতে যাচ্ছিলেন। না শুনেই জুড়ন মাঝি খলখল করে হেসে উঠল: ঠিক আছি বাবু।

গাঙের উপরে আঁধারটা তত ঘন নয়। জুড়নের অদ্ভুত চেহারা—লড়নে-ওয়ালা সে যেন। চোখে মুখে শঙ্কা নয়, সঙ্কল্প। হাল ধরে টান-টান হয়ে বসেছে। হাত দুটো এখন বুঝি রক্ত-মাংসের নয়, ইস্পাতের—আঘাতে ঠং-ঠং করে বাজবে।

প্রচণ্ড ধাক্কা একটা। ঢেউ বয়ে গেল পাটার উপর দিয়ে। খোলেও বেশ খানিকটা ঢুকল। গোঁ-গোঁ গোঁ-গোঁ করে ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে পড়ছে। গাঙ উথাল-পাথাল। ডিঙি টাল খেয়ে খেয়ে পড়ে—হায় হায়, গেল বুঝি এইবার! জুড়ন অভয় দিচ্ছে: বাতাসের বাপের ক্ষমতা নেই বেকায়দায় ফেলবে। কতক্ষণ আর লড়বে—মুরোদ জানা আছে, নেতিয়ে পড়বে এক্ষুনি।

কিসের জোরে দম্ভ, কে জানে! এখন আবার কড় কড় করে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কোনো দিকে জনপ্রাণী নেই—একটা নৌকা দেখা গেল না এতক্ষণের মধ্যে। জল, জল, জল—আর জঙ্গল বাঁ-দিকে। আর ক্রুদ্ধ মেঘ মাথার উপরে সারা আকাশ গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বৃষ্টি এল ঝেঁপে—নিচে সীমাহারা জল, উপর থেকেও জল। এক সুবিধা, বিদ্যুৎ-চমকানিতে চতুর্দিকের আন্দাজ পাওয়া গেল। ভন্নার মধ্যে জুড়ন, দেখি, দূর-গাঙের দিকে ডিঙি ছুটিয়ে দিয়েছে। সর্বনাশ, পাগল না ক্ষ্যাপা রে! ঝড়ে ধারাবর্ষণে সূচীভেদ্য অন্ধকারে মাঝির মাথায় অপদেবতা ভর করেছে ঠিক।

জুড়ন বলল, ঠিক যাচ্ছি। নয়তো চরে তুলে ডিঙির তলা ফাঁসাবে।

জুড়নই ঠিক, অনতিপরে আর সন্দেহ রইল না। ঝড়ের দম ফুরিয়ে এল, কমতে কমতে শেষটা শুধু বৃষ্টি। তা-ও গেল। আকাশ-ভরা তারা। শান্ত প্রসন্ন নদী। একটু আগে এত বড় ধুন্দুমার কাণ্ড হয়ে গেছে, কে বলবে!

কাটাখালি ছাড়িয়ে ডিঙি বিলে গিয়ে পড়ল। এক-হাঁটু, খুব বেশি তো এক-বুক জল। সে জলও বড় দেখা যায় না—ধানগাছ জলের উপরে মাথা তুলে আছে। খসখস আওয়াজ তুলে ডিঙি ধানগাছের উপর দিয়েই যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে পতিত জমি—শোলার জঙ্গল, চেঁচোঘাস। অজস্র শালুক আর শাপলা ফুটে আছে—শাদা শাপলা, লাল শাপলা। হাত বাড়িয়ে ছটা দীর্ঘ ডাঁটাসুদ্ধ তুলে তুলে ডিঙির খোলে গাদা করে ফেলেছে। দূরে দিগন্ত-সীমানায় গাছপালা—তার মধ্যে নারকেলগাছ, তালগাছ, খেজুরগাছ সকলকে ছাড়িয়ে আকাশে মাথা তুলেছে, ঐ গাছগুলোই আলাদা করে চেনা যাচ্ছে শুধু।

গা-গ্রাম ঐসব খানে—ওরই মধ্যে মুলটি গ্রাম, সেখানে ছটাদের বাগের নিচে মাদারতলায় ডিঙি গিয়ে ভিড়বে।

উদ্বিগ্ন হয়ে ছটা বার বার শুধায়: দেখতে সব তো একই রকম বাবা। ওর মধ্যে কোনটা মুলটি, কেমন করে বুঝবে?

মধুসূদন হেসে আঙুল বাড়ালেন: ঐ দেখ্। মাদারগাছ দেখতে পাচ্ছিসনে?

প্রাণপণে দৃষ্টি বিসারিত করে ছুটা বলে, না তো—

গাছ এখন ন্যাড়া কিনা, ঠাহর পাচ্ছিনে। ফাল্গুনমাস হলে রাঙা রাঙা ফুলে নজর টেনে ধরত।

বিলে পড়ে বোঠে তুলে ফেলেছে, ধ্বজি মেরে মেরে যাচ্ছে এখন। কী বাতাস! ধানগাছের খাড়া মাথায় ঝাপটা মারে, শুয়ে পড়ে গাছ জলের উপর। আবার খাড়া হয়েছে, অমনি আবার ঝাপটা। এই খেলা কাটাখালি থেকেই দেখতে দেখতে আসছে। বাদাবনে গাছগাছালি অর জেয়ার-ভাঁটার খেলা, এখানে বিলের মধ্যে বাতাসে আর ধানবনে। খেলা আর খেলা—সেখানে নিত্যিদিন জঙ্গলের খেলা দেখে এসে বিলে এই ধানবনের খেলা দেখতে দেখতে যাচ্ছে। খেলার কোথাও ছাড়ান নেই।

উঁচু মতন দেখাচ্ছে—কাছে এসে মালুম হলো ঘরই বটে। এ জিনিসের আলাদা নাম হয়েছে—টোঙ। জলের মধ্যে বাঁশ পুঁতে ছোট একটু মাচা, মাচার উপরে যৎসামান্য আচ্ছাদন। দুটো-তিনটে মানুষ ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে কোন রকমে বসতে পারে। শুতেও পারে হয়তো, তবে পা মেলে পুরোপুরি লম্বা হয়ে নয়। সে বিলাসিতার জন্যে কেউ বিলে আসে না—গ্রামেই তো ঘর-বাড়ি রয়েছে। তলায় এখানটা পাটা দিয়ে মাছ আটকেছে—মাছ ধরে, আর টোঙে বসে পালা করে দিবারাত্রি পাহারা দেয়।

মধুসূদন বললেন, দিদি এতক্ষণে রান্না-খাওয়া সেরে ঘুমুচ্ছেন। মাছ নিয়ে গেলে মাছের ঝোল-ভাত তাড়াতাড়ি হতে পারবে।

একটা বুড়োলোক এখন পাহারায়। আধেক চোখ বুঁজে লোকটা ভুড়ুক ভুড়ুক হুঁকো টানছে। মধুসূদন বললেন, মাছ আছে মুরুব্বি?

নাঃ—বলে সংক্ষেপে সেরে লোকটা নাকে-মুখে ধোঁয়া ছাড়ল।

ছুটা করকর করে ওঠে: মাছ থাকবে না তো মিছামিছি মাঝবিলে পড়ে থাকা কেন?

কথার ঢঙে কৌতুক লাগল। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখে বুড়ো বলল, কাল হাটবার ছিল—সব মাছ নিকারিরা টেনে নিয়ে গেছে।

একেবারে বাড়ন্ত কি হতে পারে? হাপর তোল, দেখি।

বলে ছুটা বুড়োর অপেক্ষায় নেই—ডিঙির ছই'য়ে উঠে গেল, সেখান থেকে এক লম্ফে টোঙের উপর। হুঁকো ফেলে বুড়ো শশব্যস্ত হয়ে উঠল: অত বড় লাফ দিল—এমন ডাকাতে-মেয়ে তো বাপের জন্মে দেখিনি। ঐ হাপর রয়েছে—টানাটানি করে পেরে উঠব না।

বাঁশের শলায় বোনা ভারীসারি বস্তু, জলের মধ্যে ডোবানো—সামান্য একটুকু জেগে আছে। ছুটা বলে, টানাটানির কী দরকার। হাত ঢুকিয়ে দু-চারটে ওর মধ্য থেকে বের করে আনি।

তালের ডোঙা হাপরের পাশে, ছটা ডোঙায় নেমে পড়ে হাপরে হাত ঢুকিয়ে দেয়। মাছ খলবল করে ওঠে।

করো কি, করো কি বুড়ো বলে ওঠে: কই-মাগুর-সিঙি রয়েছে কা'নমাছও আছে ক'টা। কাঁটা যদি মেরে দেয়, বুঝবে ঠেলা।

ছটার ভ্রূক্ষেপ নেই। বলে, এ আর কী! বুঝলে চাচা, একদিন বনমুরগি ধরতে গিয়ে সাপ এ'টে ধরছিলাম আর একটু হলে।

টুক করে বড় এক মাগুরের কানকো চেপে তুলে ধরল। কোথায় রাখা যায়, কোথায়—এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

জুড়ন মাঝি কাড়ালে এসে গামছা পাতল : এখানে ফেলে দাও—

হাপরে ছটা আবার হাত ঢুকাল। দু-হাতে দুটো মাগুর একসঙ্গে এবার। ব্যস—

কাণ্ড দেখে বুড়োর চক্ষু দুটো ঠিকরে বেরুনোর গতিক। বলে, এতে হবে কেন? নাও—

মধুসূদন বললেন, খুব হবে। অল্প মানুষ আমরা। আর দরকার নেই।

ঘাড় নেড়ে বুড়ো বলে, তিন-শত্তুর নিচ্ছ। আমি কি শত্তুর?

ছটার দিকে চেয়ে আদেশের সুরে বলল, বের করো।

রীতরক্ষার মতো ছটা ছোট একটা কই নিয়ে নিল : হলো তো?

মধুসূদন মনিব্যাগ বের করলেন। বুড়ো না-না—করে ওঠে : মেয়েকে খেতে দিয়েছি। পয়সা কিসের?

সে হয় না।

না হয় তো হাপরের মাছ হাপরে আবার ঢেলে দাও। হাটুরে পাইকার ছাড়া খুচরো বিক্রি এখানে নেই।

ছটা বাপকে বলল, তোমার অন্যায় বাবা। চাচা আমায় খেতে দিলেন, তার আবার দাম কি?

বুড়ো ফোকলা মুখের হাসি হেসে বলল, তাই দেখ দিদি মা! ঘরে আমারও মেয়ে আছে—তোমার বয়সি।

ডোঙা এদিক-ওদিক টলছে, সেই ডোঙার মাথা থেকে অবলীলাক্রমে হাঁটতে হাঁটতে ওদিককার শেষ মুড়োয় গিয়ে ছটা তড়াক করে ডিঙিতে উঠে পড়ল। জুড়নকে বলল, দাঁড়াও একটু—ছেড়ো না।

তাড়াতাড়ি একটা জামা বের করে টোঙের দিকে তুলে ধরল : ধরো, আমার বোনটিকে দিচ্ছি।

সম্পর্ক পাতিয়ে পাতিয়ে বড় মিষ্টি করে বলে মেয়েটা। বড্ড ভালো। আনকোরা জিনিসটা, দামীও নিশ্চয়। বুড়ো কিন্তু-কিন্তু করে : তোমার শখের জিনিস—

ছটা আগুন হয়ে বলে, জামা না নেবে তো তোমার মাছও আমি ছুঁড়ে ফেলে দেবো। সাফ কথা আমার, হ্যাঁ—

নিতে হলো, নিয়ে সযত্নে বুড়ো মাদুরের তলে রাখল। বলে, ঐ তো, মুলটি দেখা যাচ্ছে। তোমাদের বাড়ি একদিন যাবো, তোমার বুনডিরি সাথে নিয়ে যাবো মা।

ছটা জুড়ে দেয় : জামা পরিয়ে নিয়ে যাবে—কেমন?

ডিঙি ছাড়ল। রাধিকা বললেন, কোন্ জামাটা দিলি রে?

মুখ বাঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ছটা বলল, সেই যে শালোয়ার আর কামিজ—

রাধিকা ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, হারামজাদি মুখের কথাটা জিজ্ঞাসা করে না। দামী জিনিসটা দিলি তো দানছত্তোর করে?

ছটা বলে, বন-জঙ্গলে কেউ দেখে না বলে সেখানে এক-আধ দিন পরতাম। তাই বলে লোকালয়ের মধ্যে—তুমিই তো কত ছি-ছি করেছিলে মা। আমার হলো কানা গরু বামুনকে দান—নিজে পরব না, তাই দিয়ে দিলাম। হি-হি-হি—

॥ দশ ॥

ন্যাড়া-শিমুলতলায় ডিঙি বাঁধল। ডাঙা ছুঁতে না ছুঁতে ছটা লাফিয়ে পড়ে দে-ছুট। কাদা-জল এখানে-ওখানে, ছিটকে উঠে গায়ে লাগে। পুকুর-পাড়ে এসে লহমার তরে থমকে দাঁড়াল। কানায় কানায় জল উপচে পড়ছে। ছটার ইচ্ছে করে, ঝপ্‌পাস করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি—জলে দাপাদাপি করে কলমিলতা ছিঁড়ে ডুবসাঁতার দিয়ে চিতসাঁতার দিয়ে বার কতক এপার-ওপার করে দেহটা চাঙ্গা করে নিই। তিন দিন ডিঙির উপর কাটিয়ে হাতে-পায়ে খিল ধরে গেছে। হঠাৎ গিয়ে পড়ে পিসিকে চমকে দেওয়া তাহলে হয় না। অতএব সাঁতার মুলতুবি রইল, রক্ষে পেয়ে গেল পুকুর। ছটা ডবল জোরে ছুট দিল।

ভাবিনী পিসি দাওয়ায়। ডাঁটি-ভাঙা চশমা নাকের উপর উঠেছে। কি গতিকে চালের সঙ্গে মুসুরিকলাই মিশে গেছে। মুসুরি ঠাকুরমশায়দের মতে আমিষ—আমিষ-মিশানো চালে বিধবা মানুষের ভাত হবে কমন করে? চাল অতএব কুলোয় ঢেলে একটা একটা করে মুসুরি বেছে ফেলছেন। ক'দিন ধরে তাঁর এই কাজ। চিলের মতন হঠাৎ ঝাপটা মেরে চাল ছড়িয়ে কুলো সরিয়ে নিল।

ভাবিনী গর্জে উঠলেন : কে রে অলপ্পেয়ে?

সমান গর্জন বিপরীতে : কুলোয় পা ঢেকে রেখেছ, পায়ের ধুলো নেবো না?

ছটার দিকে ভাবিনী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। ছটা ধমক দেয় : মুখের বাক্যি হরে গেছে? আগে তো পিসিমা এমন ছিলে না!

ভাবিনী বললেন, ধাড়োসধড়ো হয়ে গেছিস বেশ।

ছটার পুনশ্চ ধমক : খুঁড়ছ?

ওমা, কখন? একেবারে পাটকাঠিখানা ছিলি, হাওয়ায় উড়তিস—এখন একটু মানুষের মতন.. আর সব কই রে? মধু আসেনি?

দেখতে দেখতে পাড়া ভেঙে এসে পড়ল। নোনা রাজ্যে বাদাবনে কাটিয়ে এল, কেমন হয়ে এসেছে দেখি। বর্ধনদের গিন্নি বললেন, খাসা শ্রী খুলেছে ছটাকির মা। মেয়ের বিয়ে-থাওয়া দাও এবারে?

রাধিকা বললেন, বিয়ে কি আমাদের হাতে দিদি? আর-জন্মে যাদের হাঁড়িতে চাল দিয়ে এসেছে, তাদের জিনিস সময় হলে তারাই খুঁজেপেতে নেবে। বয়স কী-ই বা, আর চাল-চলনে তো একেবারেই ছেলেমানুষ।

দিন সাতেক বাড়ি কাটিয়ে যতীন আজ মুলটি এসে পৌঁছল। মধুসূদনের সঙ্গে নতুন কর্মস্থান কুপ-অফিসেই যাবে। খেতে বসে রাধিকার পানে মুখ তুলে সে অবাক হয়ে তাকাল : জঙ্গলে মাছের রকমারি তরকারি করে খাওয়াতেন মা, এখানে আঁশটে গন্ধটুকুও পাচ্ছিনে।

রাধিকা বললেন, হাটবার ছাড়া মাছ মেলে না এখানে।

যতীন বলে, পুকুরে বড় বড় আফালি করছিল। বাবু কদ্দিন পরে বাড়ি এলেন—নোনা রাজ্যে মাছ যতই খান, বাড়ির পুকুরের স্বাদ আলাদা। আমি মাছ ধরে দেবো।

মধুসূদন পাশাপাশি খাচ্ছিলেন। বললেন, পুকুরের কানায় কানায় জল, মাছ ধরা এখন চাট্টিখানি কথা নয়।

যতীন বলে, ছিপে ধরব বাবু। যেগুলো ভাসন্ত মাছ তার ভিতরের কতক কতক জালে বেড় পড়ে। ছিপের আলাদা ব্যাপার—সারা পুকুরে একটা মাছও যদি থাকে, ঠিক মতন চার দিয়ে সেই মাছটাও টেনে তুলতে পারি। নইলে আর মাছুড়ে বলে কেন।

ছটা আহ্লাদে লাফিয়ে ওঠে : বড় বড় রুই কাতলা মৃগেল আছে, সবাই বলে। একটা দুটো তোল দিকি কেমন। ছিপে মাছ মারতে বড্ড মজা।

যতীন বলে, হুইল-ছিপ আছে? এমনি ছিপেও যে হবে না, তা নয়। আফালিতে আন্দাজ হয় পাঁচ-সাত সেরের নিচে মাছ নেই। হুইলের সুবিধে হলো, সুতো ছিঁড়ে পালাতে পারবে না। যত টানছে তত আমি সুতো ছেড়ে যাচ্ছি। অবিশ্যি না যদি পাওয়া যায়, মাছ-মারা তাই বলে কি আটকে থাকবে?

খোঁজখবর করে ছটা হুইল-ছিপই জুটিয়ে আনল। উঠোন খুঁড়ে কেঁচো তুলে দিল। কুঁড়োর সঙ্গে নালশোর ডিম চটকে চার বানাল। যেমন যেমন যতীন বলছে। পুকুর-ধারে গিয়ে যতীন ছিপ ফেলে বসল, ছটা একেবারে পাশটিতে। মাছ মারতে বসে কথা বলা যায় না—বলতেও হয় না। মনের কথা ছটা ঠিক ঠিক বুঝে নিয়ে দরকারের জিনিস হাতের কাছে এনে ধরছে।

বৃষ্টি এল ঝুপ ঝুপ করে। যতীন বলে, ঘরে যাও না খুকি! শখ করে জলে ভেজা কেন?

এখনই যদি মাছে খায়?

আমি তো রইলাম।

তোমার যদি ঝিমুনি ধরে, চোখ বুঁজে পড়ো!

বাড়ির ওদিক থেকেও বিষম ডাকাডাকি লাগিয়েছে। অতিষ্ঠ হয়ে ছটা উঠল। তক্ষুনি আবার, কোন অজুহাতে কে জানে, ফিরে এসে জায়গা নিয়ে বসল।

ঘোর হয়ে গেছে। ছটা বলল, তুমি কেবল মুখসর্বস্ব যতীন-দা। পরের বাড়ি থেকে হুইল চেয়ে নিয়ে এসেছি—জিজ্ঞাসা করলে কি জবাব দেবো?

যতীন বলে, চারে তো এসেছিল। তোমাদের পুকুরের হলো নবাব-বাদশা

মাছ—কেঁচো তারা পছন্দ করে না। ঠোক দিয়ে দিয়ে ফিরে গেল। হতো বোলতার টোপ, না-গিলে যেত কোথায় দেখতাম।

বিরস মুখে হুইলের সুতো গোটাতে গোটাতে বলল, মাছেদের কাছে কেঁচো হলো ডাল-ভাত, বোলতার ডিম কোপ্তা-কাবাব।

ছটা অধীর কণ্ঠে বলে, বললে না কেন আমায় সে কথা?

বললে কি হতো? বৃষ্টিবাদলায় এখন চাক পাওয়া সোজা নয়।

ছটা বলে, পাই না পাই দেখো। কালকের মধ্যেই দেখিয়ে দেবো।

যতীন বলল, কাল বিকেলে আমরা তো রওনা হয়ে যাচ্ছি।

থেকে যাও যতীন-দা। অন্তত একটা দিন। যা-হোক একটা ছুতো বের করো। বলো যে পেট কামড়াচ্ছে।

মাছ খাবার জন্যে? ধুস। আজকে ডাহা বেকুব হলাম। জলের মাছের মরজি কিছু বলা যায় না, কালও যদি এমনি হয়। কী দরকার! পথের দুটো-তিনটে দিনের কষ্ট—তারপরে তো মাছের ভাণ্ডারে পেঁৗছে গেলাম।

যতীন গেছে, ছটা তা বলে মতলব ছাড়েনি। পুকুরের মাছ তুলবেই ডাঙায়। হুইল-ছিপটা ফেরত না দিয়ে রেখে দিয়েছে—যাদের ছিপ তারাও গরজ করেনি এখন ছিপের মাছের মরশুম নয় বলে। ঠিক দুপুরে বাড়ির সব ঘুমোলে ছটাই চুপিসারে এসে বসবে। বড় মাছ যদি গাঁথতে পারে, তখন মা'র গালি দেবার কথা মনে থাকবে না—জুত করে রাঁধবে বলে রান্নাঘরে ছুটবে।

মউলরা আকাশে মুখ করে মৌমাছির পিছনে ছোটে—ছটার ঠিক সেই কায়দা। বোলতা ওড়া দেখলেই পিছু নেয়। মেয়েটার অসাধ্য কর্ম নেই—বের করেছে এক চাক। বর্ধনদের ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপের কার্নিশের নিচে। মানুষের নজর ও বৃষ্টি এড়ানোর জন্য আহা-মরি জায়গা বেছেছে বোলতারা। ভাঙা দেয়ালে উঠে অশ্বত্থগাছের ভিতর দিয়ে ঠাহর করে করে অনেক চেষ্টায় ছটা চাক বের করল।

লম্বা লগি নিল. লগির মাথায় কাস্তে। নিজের মাথায় কাপড় জড়িয়েছে - মানুষ বলে ধরতে না পারে। লগিতে নাগাল পাচ্ছে না তো অশ্বত্থের একটা ডালে উঠে পড়ল। দিল কাস্তের পোঁচ। কপাল মন্দ, গ্রহের ফের! চাক ভেঙে মাটিতে না পড়ে অশ্বত্থের ডালে-পাতায় আটকে গেল। ছটা যেখানটা দাঁড়িয়েছে, তারই কাছাকাছি। আর যাবে কোথা—ঝাঁকে ঝাঁকে বোলতা এসে পড়ল। নেমে পড়বে ছটা, তা দিশা করতে দেয় না—আক্রোশ ভরে হুল ফোটাচ্ছে। বিপদের মধ্যেও ছটার টনটনে হুঁশজ্ঞান—অদূরের পোয়ালগাদা আন্দাজ করে ঝাঁপ দিল।

বিষম জ্বলুনি, কিন্তু মুখে টু-শব্দটি নেই—শাড়ির কাপড় আরও ভাল করে গায়ে-মাথায় জড়িয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পোয়ালের মাচার নিচে চলে গেল। নিঃসাড়ে পড়ে আছে—বোলতায় মানুষ-শত্রু বলে বুঝবে না, গাছের মুড়ো বা

ঐ জাতীয় কিছু। দাঁতে দাঁত চেপে প্রাণপণ চেষ্টায় সে যন্ত্রণা সামলাচ্ছে। কাজ
দিল এতে—কিছু পাক-চক্কোর দিয়ে বোলতারা চলে গেল। গুটি-গুটি বেরিয়ে
তখন দৌড়। ঘরে গিয়ে মেজের উপর এপাশ-ওপাশ করছে, মুখে তখনও
আওয়াজ নেই। কানে শুনে পাছে লোকজন ছুটে আসে। সে ভারি লজ্জার
বকুনিও হবে একচোট।

তবু চাপা দেওয়া গেল না। যন্ত্রণা কমল, কিন্তু মুখ ফুলে ঢোল। চো
দুটো আছে কি নেই—ফুলোর মধ্যে ছোট্ট হয়ে কুতকুত করছে।

রাধিকা ঢুকে বললেন, শুয়ে কেন রে অসময়ে?

ছটা বলে, ছুটোছুটি করলে দোষ, আবার চুপচাপ শুয়ে আছি তাতেও
দোষ?

দেড় পহর বেলায় তুমি তো এমনি এমনি শুয়ে থাকার মেয়ে নও। মু
ঢাকছিস কেন? দেখি—

জোর করে রাধিকা মেয়ের মুখ ঘুরিয়ে ধরলেন।

॥ এগারো ॥

মণিলালের খবর : পরীক্ষা দিয়ে ছোটমাসির বাড়ি সে আম খেতে গিয়েছিল। বনেদি গৃহস্থ তাঁরা—চার-চারটে আমবাগানের মালিক। কিন্তু সে-আমের পাট কবে চুকেবুকে গেছে, অদ্যাপি ফেরে না। পড়াশুনোর ঝঞ্ঝাট নেই, স্ফূর্তির প্রাণ এখন। আবার অন্য কোথাও গেছে কিনা কে জানে।

সেই মানুষ এক সকালে ছটাদের বাড়ি হঠাৎ এসে উপস্থিত। উঠানে এসে সাড়া দিচ্ছে : কই রে, গোবিন্দর-মা কোথায় গেলি?

ফিরেছে কাল রাত্রে। মধুসূদনদের বাড়ি আসার কথা শুনেছে। এবং বোলতার কামড়ে ছটার নাস্তানাবুদ হবার কথাও। রাত পোহালেই চলে এসেছে। শুধু গোবিন্দর মা-য় সুখ হচ্ছে না, সশব্দে পুরো ছড়া কাটছে : গাল-ফুলো গোবিন্দর-মা, চালতে-তলায় যেও না—

ছটা পুরোপুরি আরোগ্য হয়ে গেছে—ফুলোটুলো কিচ্ছু নেই। তরতর করে সামনে এসে মুখ বাড়িয়ে দিল : দেখা, গাল-ফুলো কোথায়! কেন মিথ্যে করে 'গোবিন্দর-মা' বলবি?

মণিলালের এ্যাব্বড়ো-এ্যাব্বড়ো চোখ। বছর দেড়েক দেখা নেই—বিধাতা এর মধ্যে গড়েপিটে একেবারে যে নতুন করে দিয়েছে। নোনতা জলহাওয়ার দরুন রংটা কিছু ময়লা—তাতেই বেশি বাহার খুলেছে।

মনোভাবটা ছটা না বুঝতে পারে। দেমাকে তাহলে ধরাখানাকে সরাজ্ঞান করবে। ধমকের সুরে মণিলাল বলল, বনে থেকে থেকে তুই আর মানুষ নোস ছটা।

ছটা মেনে নেয় : পাখি। বসন্তবউরি কি কোকিল। কিংবা দুধরাজ।

ঘাড় নেড়ে মণিলাল বলে, উঁহু, বাঁদর। গাছে গাছে বেড়াস। কী সর্বনেশে কাণ্ড করেছিলি—অল্পের জন্য বেঁচে গেছিস।

কৈফিয়তের সুরে ছটা বলল, নচ্ছার মাছগুলোর বোলতার ডিম ছাড়া অন্য কিছু মুখে রোচে না, কি করব? চাকের জন্যে গাছে উঠতে হলো।

মণিলাল বলল, বর্ষাকালে খাল-বিল মাছে ঠাসা। পুকুরে ছিপ ফেলে এখন হাঁ-পিত্যেশ বসে থাকে, এমন গাড়োলা দেখিনি বাবা। তোদের ন্যাড়াকে খানকয়েক চারো-ঘুনসি কিনে দিস, সন্ধ্যেবেলা বিলের এখানে-ওখানে পেতে আসবে, সকালে ঝাড়ার সময় মাছে খালুই বোঝাই হয়ে যাবে দেখিস।

মধুসূদনের বাড়ির অদূরে হাই ইস্কুল। পুরানো ইস্কুল—নামডাক আছে, ছাত্রদের মধ্যে কেষ্টবিষ্টু হয়েছেন অনেকে। হতে এখনো পারে। ছাত্র যথেষ্ট,

ইস্কুলবাড়ি খোড়োচালের হলেও নিন্দের নয়। অভাব শুধু মাস্টারের—মাইনে না পাওয়ার দরুন মাস্টার টেকে না। বিশেষত মাস্টারের গায়ে একটা-আধটা পাশের আঁচড় যদি থাকে।

পদ্মপত্রে জলবৎ মাস্টারেরা টলটলায়মান, চিরস্থির শুধুমাত্র ক্লার্ক, বিপিন সমাদ্দার। তিনি এসে মণিলালকে পাকড়ালেন: বাড়ি বসে গজালি না পিটে কিছু বিদ্যাদান করো। ইস্কুলের পুরানো ছাত্র হিসাবে দাবিও আছে তোমার উপর।

মণিলালকে অতএব ইস্কুলে গিয়ে মাস্টারের চেয়ারে বসতে হচ্ছে। বিপিনের হাত এড়ানো অসম্ভব।

সন্ধ্যার পরেই আলো নিভিয়ে ভাবিনী নিজের ঘরে শুয়ে পড়েন। জ্ঞান দেবেন বলে ভাইঝিকে সেই সময়টা প্রায়ই ডাকেন।

আর ছোট্টটি নোস। স্বভাবে নরম-শরম হবি—এ দেখি আরও উল্টো হয়ে এসেছিস।

ছটা বলে, বাদাবনে পাঠিয়েছিলে যেমন!

ভাবিনী বলে যাচ্ছেন, হাঁটা তো ভুলেই গেছিস, খালি ছোটা আর লাফানো। মাটির উপরেই বা কতক্ষণ—এ-গাছে আর ও-গাছে। জলে নামলি তো পানকৌড়ির মতন সারাবেলান্ত ডুবছিস আর ভাসছিস।

করুণ সুরে ছটা বলে, অনভ্যাস পিসিমা। বাদাবনে হাঁটব কোথা? গাঁয়ের মতন সমান চৌরস জায়গা তো নয়—জঙ্গল আর জলা। জঙ্গলে পা দিলেই তো বাঘ দাঁতাল আর সাপ চক্কোর মারতে লাগল চৌদিকে।

ভাবিনী শিউরে উঠে বললেন, সত্যি?

জিজ্ঞাসা কোরো বাবাকে। আর জলে নেমেছি তো কুমিরের তাড়া। বাঘে তবু হাতখানা পাখানা ছিঁড়ে সজনের ডাঁটার মতো চিবিয়ে চিবিয়ে খায়। হাত নেই পা নেই, মানুষটা তবু বেঁচে রয়েছে—বাদাবনে কত এমন দেখতে পাবে। কুমিরের টুকরো-টাকরায় ক্ষিধে মেটে না। হাঁ করে আমার মতন আস্ত মানুষটা মুখের মধ্যে পুরে কোঁৎ করে গিলে ফেলে। ঠিক সেই লহমায় কেউ যদি কুমিরটাকে মেরে পেট চিরে ফেলে, একেবারে নিখুঁত আমায় পেয়ে যাবে—গায়ে দাঁতের একটা দাগ পড়েনি। পেট থেকে বেরিয়ে পড়েই হয়তো বলছি, ক্ষিধেয় মরে যাচ্ছি পিসি, তোমার চালভাজা ছাঁচ-বাতাসা যা থাকে বের করো।

পিসি বলে উঠলেন, ওরে বাবা!

কণ্ঠে দেমাকের সুর এনে ছটা এবার বলে, সাঁতার কেটে সেই কুমিরের মুখ থেকে পালানো—বোঝ কী ব্যাপার! বুকের নিচে কলসি নিয়ে গল্পগাছা করতে করতে সে-রকম সাঁতার হয় না। জলের উপরে রেলগাড়ি ছুটিয়ে যাচ্ছি যেন। খানিকটা পিছু পিছু ছুটে থোঁতামুখ ভোঁতা করে কুমির হাঁপাতে হাঁপাতে

বাসায় ফিরে যায়। আমিও ততক্ষণে ডাঙায়।

খুব জমে গিয়েছে। ভাইঝির ডানপিটেমি শুনতে শুনতে ভাবিনীর মন চলে যায়—শ্বশুরবাড়ির বউ ছিলেন তিনি যখন। সে বাড়ি একেবারে গাঙের উপর। বাঘ আসত মাঝেমধ্যে, রাতদুপুরে ফেউ ডাকত। কুমিরের অত্যাচারে গাঙের কাছাকাছি কেউ গরু বাঁধত না। খুঁটো উপড়ে গরু টানতে টানতে গাঙে নিয়ে যেত, অসহায় গরু হাম্বা-হাম্বা করত। এমন অনেক হয়েছে। বউ হয়েও ভাবিনী এসব গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না—রাতদুপুরে উঠে জলকাদা ভেঙে গাঙের ধারে মিছরিগোলা-গাছের তাল কুড়োতে যেতেন। বউয়ের কীর্তি-কলাপ টের পেতেন শুধুমাত্র বর—টিপিটিপি তিনিও পিছু নিতেন। মিছরি-গোলার তাল অতি সুতার—রসগোল্লা ফেলে লোকে ঐ তাল চাইত।

ছটার গল্প চলছে ওদিকে : কুমিরের সঙ্গে, পিসিমা, কামটও গিজগিজ করছে। কামট আরও সর্বনেশে—জলের নিচে কোথায় যে আছে, ঠাহর পাবার জো নেই। দাঁতে ক্ষুরের ধার। কুচ করে হাতখানা কেটে নিয়ে গেল—কষ্ট নেই, টেরই পেলে না। চানের পর ডাঙায় উঠে খোঁজ হলো : কইগো, আমার যে একটা বাঁ-হাত ছিল—গেল কোথা?

ঘেটের-বাছা সুভালাভালি ঘরে ফিরেছে—অন্ধকারে ভাবিনী তার মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। মামলা এখন তারই স্বপক্ষে, বুঝতে পারছে ছটা। বলে, তুমিই পিসিমা বিচার করে বলো। গাছে চড়ব না, জলে সাঁতরাব না—সব অভ্যেস একদিনে ঝেড়ে ফেলা যায়? চুপচাপ ঘরের মধ্যে বসে শুয়ে কাটাতে বলছে—তাব চেয়ে মুখ-হাত-পাগুলো কেটে দিলেই তো চুকেবুকে যায়। কী বলো, অ্যাঁ পিসিমা?

পুরোপুরি সমর্থন দিয়ে ভাবিনী বলে উঠলেন, এখন বললে কি হবে? নিয়ে যায় কেন ওরা বাদায়? বলেছিলাম তো. মেয়ে আমার কাছে রেখে যা। উল্টে তখন আমায় সুদ্ধ টেনে নিতে চায়।

ছটা শিউরে উঠে বলল, ভাগ্যিস যাওনি। তোমারও ঠিক আমার দশা হতো পিসিমা। সাঁতরাবার জন্য, গাছে ওঠার জন্য হাত-পা কুটকুট করত। তোমার দেহে কুলাত না। কষ্টই কেবল বাড়ত।

চুমকুড়ি কুপ-অফিসে ঘর একখানা মাত্র। আর আছে কয়েকটা বোট—তাতেও কিছু লোকজন থাকে। হেডগার্ড সাতকড়ির বোটে স্থিতি, ডাঙার উপর ঠাঁই মেলেনি।

রাত্রে ঘরের মধ্যে পাশাপাশি দুই-মশারির ভিতরে দু'জন—মধুসূদন আর যতীন। বউ-মেয়ে নিয়ে বহুদিন একত্র থেকে মধুসূদনের অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে—কাজের সময় যা-হোক একরকম, অন্য সময় বড্ড খালি-খালি ঠেকে। যতক্ষণ যতীনেব হুঁ-হাঁ দেবার তাগত থাকে, মধুসূদন তার সঙ্গে সুখ-দুঃখের

কথা বলেন। সুখ আর কোথা, বলেন দুঃখের কথাই : দূর দূর! চাকরির মুখে ঝাড়ু মেরে বাড়ি গিয়ে উঠব। ছটার মা'র ইচ্ছেও তাই। খুদকুঁড়ো যা আছে, চলে যাবে একরকম করে। জঙ্গল-রাজ্যে নোনাজল খেয়ে চিরকাল কেন পড়ে থাকতে যাব?

যতীন প্রতিবাদ করে : শুধুই কি আর নোনাজল? নোনাজলে মাছ কিরকম সেটা বলুন বাবু!

মধুসূদন খিঁচিয়ে ওঠেন : খালি মাছ আর মাছ! মাছ খেয়েই বুঝি চতুর্বর্গ লাভ হয়?

যতীন একটু নীরব থেকে মৃদুকণ্ঠে বলে, বাড়িতে সুখ-সোয়াস্তি ঠিক, খাওয়ার বেলা কিন্তু কলমিশাক আর বীচেকলা-ভাতে। শুধু সুখ-সোয়াস্তিতে আমার পোষাবে না বাবু। আপনি চাকরি ছাড়লে আমায় অন্য কারো সঙ্গে জুটিয়ে দিয়ে যাবেন। রাঁধাবাড়া করব, খাবো-দাবো, ব্যস। বাদা ছেড়ে আমি যাবো না।

গোড়ায় গোড়ায় মধুসূদন ভারি মুষড়ে পড়েছিলেন। অমনি ধরনের কথা-বার্তা প্রায়ই হতো। সে ভাবটা ক্রমশ কাটিয়ে উঠছেন, বিষণ্ণ মুখে ধীরে ধীরে হাসি দেখা দিচ্ছে।

খেতে খেতে একদিন মধুসূদন খলখল করে হেসে উঠলেন—শোওয়া পর্যন্ত সবুর সয় না। বললেন, 'খেদাই নে তোর উঠোন চষি'—মুখুজ্জের চক্রান্তটা তাই। কুপ-অফিসে চালান করে ভাবল, শুখো মাইনের গোনা টাকায় পোষাতে পারবে না—চাকরি ছেড়ে বাপ-বাপ করে পালাবে। সেটি হচ্ছে না, গ্যাঁট হয়ে চেপে রইলাম। আরে বাপু, হোক না অজঙ্গি জঙ্গল—দেনেওয়ালা যিনি তাঁর এলাকার বাইরে তো নয়। তাঁর দয়া হলে ছপ্পর ফুঁড়ে দিয়ে দেবেন!

চুমকুড়ি অফিসেও অতএব খনি আবিষ্কার হয়েছে। সে খনি সোনা-রুপোরও নয়, কোহিনুর-হীরের—মধুসূদনের কথাবার্তা ও হাসির বহর দেখে মালুম পাওয়া যাচ্ছে।

কপাল বটে মণিলালের। চারিদিকে গাদা গাদা বেকার, আর মণির বেলা পরীক্ষা দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে অমনি চাকরি। ফল বেরুনোর সবুর সয় না।

এবং হপ্তা দুই যেতে না যেতেই প্রোমোশান। বিপিন সমাদ্দার বললেন, খাসা পড়াও হে তুমি। মুলটি হাই ইস্কুলের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট-হেডমাস্টার হয়ে যাও কাল থেকে।

মণিলাল অবাক হয়ে বলে, বলেন কি! এখন অবধি গ্রাজুয়েটও তো নই।

বিপিন বলেন, হওনি—হয়ে যাবে। দু-দুখানা পাশ কবজা করে ফেলেছ, ওখানাও আটকে থাকবে না। ইস্কুলে হেডমাস্টার নেই, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট-হেডমাস্টারও নেই—কাজের বড় অসুবিধা। একখানা সার্কুলারের নিচে নাম-সই করার লোক

পাইনে। কাল থেকে তুমি সই দেবে—নামের নিচে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট-হেডমাস্টার। 'হেডমাস্টার' দস্তুর মতো ফলাও করে লিখবে, তার আগে একটুখানি হিজিবিজি—'অ্যাসিস্ট্যাণ্ট' লিখেছ, না-ও বুঝতে পারে। না পারে তো বয়ে গেল, সেইটেই তো চাই—'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ'—আইন বাঁচানো নিয়ে কথা।

বিপিন সমাদ্দারের নজরে ধরেছে—মাইনে কদ্দুর কি জুটবে বলা না গেলেও চাকরি যে পাকা তাতে সন্দেহমাত্র নেই। বিপিন বললেন, ইস্কুল তোমারই—সকলকে দিয়ে-থুয়ে যা থাকবে, তুমি নিয়ে নিও। আমরা তাকিয়েও দেখতে যাবো না। টাকার গরজই বা কি তোমার? বছর-খোরাকি ধানের সংস্থান আছে, আওলাতপসার আছে, মামামশায়ের বনকরের চাকরি—কোমর বেঁধে তুমি দশের হিত করে বেড়াও।

এ-হেন পাকা-চাকরির জন্য মণিলালের মা দত্তগিন্নি সাত-সকালে ভাত রেঁধে দিতে নারাজ। অতএব চিঁড়েটা মুড়িটা খেয়ে মণিলাল ইস্কুলে আসে, টিফিনের সময় পশ্চিমপাড়ায় মামার-বাড়ি গিয়ে দুপুরের ভাত খেয়ে আসে। কিন্তু মুশকিল হয়ে দাঁড়াল, ঐ পথের চারটে জায়গায় সাংঘাতিক রকমের কাদা। পা দিলে হাঁটু অবধি তলিয়ে যায়, সেই পা টেনে তুলতে চোখের জল বেরোয়। দুটো ভাত খাবার জন্য এত কষ্ট পোষাবে না। টিফিনে ইদানীং সে বেরুচ্ছে না, এটা-ওটা খেয়ে থাকে।

কী করে রাধিকার কানে গেছে। ইস্কুল অদূরে, একদিন তিনি মণিলালকে পথের উপর ধরলেন : কাদা ভাঙার ভয়ে মামার-বাড়ি যাও না, সারা বেলান্ত উপোস করে থাকো। বলি, আমরা কি চালের ভাত খাইনে? আজ থেকে আমার এখানে খাবে।

খেতে হচ্ছে অতএব। বাড়ির সামনে দিয়ে পথ, এড়ানোর উপায় নেই।

বিনি কাজে নিত্যিদিন খাওয়া কেমন-কেমন লাগে। নিজেই মণিলাল কথা তুলল : এখন ছুটা পড়াশুনো করে? বনকর অফিসে কিন্তু বেশ হচ্ছিল—না মাসিমা?

পড়ে বই কি! রাধিকা ভ্রু-ভঙ্গি করে বললেন, গাছ থেকে তলায় লাফিয়ে পড়ে, পাড় থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। একটা দুটো সম্বন্ধ আসতে লেগেছে—এসেই তারা জিজ্ঞাসা করে, মেয়ের লেখাপড়া কদ্দুর?

মুরুব্বি মানুষের ঢঙে মণিলাল বলে, যখন যে হুজুগ ওঠে। আপনাদের কালে জিজ্ঞাসা করত, মেয়ে রাঁধাবাড়া সেলাই-ফোঁড়াই কেমন জানে? এখনকার জিজ্ঞাসা লেখাপড়া। এ তবু ভালো—শহর-জায়গায় আরও উদ্ভট মাসিমা, মেয়ে নাচতে-গাইতে পারে কেমন? বুঝুন!

একটু ইতস্তত করে বলে, ইস্কুলে চারটেয় ছুটি। বাড়ি গিয়ে চুপচাপ বসে থাকা ভাল লাগে না। ছুটাকে ঐ সময়ে একটু-আধটু পড়াই না কেন। কি বলেন আপনি?

রাধিকা খুশি হয়ে বললেন, ভাল কথা বলেছ বাবা। কিছু যদি রপ্ত করে

দিতে পার, বিয়ের পক্ষে সুবিধা হয়। যেটুকু পারো, সেই লাভ।

শুভস্য শীঘ্রম্—সেই বিকাল থেকেই। মণিলালের স্বর গম্ভীর—মাস্টার-মানুষের যেমন হতে হয়, হালকা হলে পড়ুয়া ভয় করবে কেন? বলে, আমি চলে আসার পরে বইয়ের পাতা খুলতিস একটু-আধটু—না, বনে বনে বাঁদরামি শুধু?

ছটা কলকল করে বলল, সেই বই সারা করেছি, তার পরে আরও কত। বাবা পড়া ধরত যে—না পারলে ঠেঙানি। বাঘিনীপিসিমা ছিল না, আমার হয়ে কে লড়বে? নির্ভয়ে ঠেঙাতে পারত।

বই হাতে দিয়ে মণিলাল বলল, পড় দিকি।

উল্টে-পাল্টে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছটা দেখছে।

মণিলাল বলে, কি হলো রে?

পড়ব?

বললাম তো। পড়ার জন্যে তিথি-নক্ষত্র, অমৃতযোগ-মাহেন্দ্রযোগ দেখতে হবে নাকি?

ছটা আবার বলল, পড়ে যাই তা হলে—কেমন?

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পড়ছে, কয়েক ছত্র পড়ার পরে বেগ এসে যায়। গড়গড় করে পড়ে যাচ্ছে: নচ্ছার বজ্জাত লম্বা-ধিড়িঙ্গে তালপাতার সেপাই—

চমক খেয়ে মণিলাল বলে, বইয়ে আছে নাকি?

ছটা বলে, নয় তো পাচ্ছি কোথা?

দেখি কেমন! 'সীতার বনবাসে' এই সমস্ত? চালাকির জায়গা পাসনি? এক টানে মণিলাল বই কেড়ে নিল: দেখা কোন্‌খানে—

ছটা নিরীহ মুখে বলে, নেই বুঝি? যুক্তাক্ষর-টর তেমন আসে না আমার। ঐ সমস্তই রয়েছে, মনে হলো।

সুর পালটে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে: না থাকলেও থাকা উচিত ছিল। গোড়ায় তো শিখিয়ে নিতে হবে। তা নয়, বসেই অমনি এগজামিন—শক্ত শক্ত দাঁতভাঙা কথা। সহজ কথা দুনিয়ার উপর থেকে উড়ে-পুড়ে গেছে যেন। তার মানে, বকুনি খাওয়ানো মায়ের কাছে। শুধু বজ্জাত কেন, আপনি মাস্টারমশাই একেবারে হাড়-বজ্জাত।

॥ বারো ॥

ঠাকুরবাড়ি রথযাত্রা ও মেলা। লোক জমেছে, বাইরে থেকে দোকানপাট এসেছে। নাটমণ্ডপে যাত্রার আসর। পালা আরম্ভ হতে বেশ খানিকটা রাত্রি হয়ে গেল। কিন্তু আকাশের অবস্থা ভাল না। রথের ঠাকুরদের উদ্দেশে মনে মনে সব মাথা কুটছে : সামলে যায় যেন ঠাকুর—যাত্রাগান পণ্ড না হয়।

মণিলাল মেলায় খানিকটা ঘোরাঘুরি করল, নাটমণ্ডপে জলচৌকির উপর তার জন্যে আলাদা করে রাখা আসনে বসল একটুখানি। আকাশের দিকে ও হাতঘড়ির দিকে চেয়ে তড়াক করে সে উঠে পড়ল—বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এবং ন'টা বেজে গেছে। রাত্রে একচোট ঢালবে, সন্দেহ নেই। যেতে হবে নন্দনপুর অবধি নোনাখোলার মাঠ ভেঙে।

দত্তবাড়ির সেই আগেকার মনু নয়—হাই ইস্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট-হেডমাস্টার রীতিমত। পরনে অতএব ধোপদস্ত কাপড়, গায়ে ধবধবে কামিজ, পায়ে বার্নিশ-জুতো। এত সমস্ত নিয়ে সংকটে পড়েছে সে। তবু রক্ষে, রাত্রিবেলা কেউ দেখতে পাচ্ছে না এখন। কাপড় হাঁটুর উপর তুলে মালকোঁচা সেঁটেছে, জামা যথাসম্ভব কোমরে গুঁজেছে। বাঁ-হাতে জুতোজোড়া ঝুলিয়ে নিয়েছে, ডান হাতে হেরিকেন। অতিশয় সন্তর্পণে যাচ্ছে—পা পিছলে আছাড় না খায়, কাপড়-জামা লাট হয়ে যাবে তাহলে।

হলে হবে কি—ছড়াৎ করে কাদাজল কোনদিক দিয়ে আচমকা গায়ের উপর পড়ল। ভূতের কারসাজি বলে অন্ধকার পথে হঠাৎ একবার মনে হলো। কিংবা ক্লাস নাইনের সুশীল সুবোধ ছেলেগুলোও হতে পারে, সম্প্রতি হাফ-ইয়ারলি এগজামিনের ইংরেজিতে যাদের বেধড়ক ফেল করিয়েছে। মেলা থেকেই পিছু নিয়েছে ঠিক—একা এমন অরক্ষিত অবস্থায় মাঠের রাস্তায় আসা ঠিক হয়নি, সঙ্গীসাথী জুটিয়ে আনা উচিত ছিল।

এত সমস্ত চকিতে মনে পড়ে গেল। হেরিকেন তুলে ধরে কড়া গলায় হাঁক দিল : কে রে?

কর্মটি ইস্কুলের ছেলেদের নয়—ভূতেরও নয়, সেই জাতীয় বটে—পেত্নীর। হেরিকেনের যেটুকু আলো গায়ে পড়েছে—কাদামাখা পরিপূর্ণ এক পেত্নীই।

মণিলাল হুঙ্কার ছাড়ল : ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে মাঠে কি করিস?

মেলায় তো ছিলাম। গান ভাল লাগল না তোরই মতন। তুই উঠলি তো আমিও উঠে পড়লাম।

যেটা কানে সবচেয়ে কটু লাগছে, সেইটে মণিলাল আগে সেরে নেয় :

তুই-তোকারি করিস কেন? ইস্কুলের বড় মাস্টার এখন আমি, তোরও প্রাইভেট মাস্টার।

ছটার হাজির-জবাব : সে যখন আছিস তখন। তখন তো আপনি-আপনি করে ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাই। বল্ তাই কিনা—

কথা সত্যি, মণিলাল ভেবে দেখল। এবারে আসল প্রশ্ন : যাচ্ছিস কোথা তুই?

যাচ্ছিলাম বাড়ি—

বাড়ি তো পেছনে ছেড়ে এসেছিস।

তুই আছিস বলে বাড়ি ঢুকিনি। ভাবলাম, একা নই যখন ভয় কিসের?

ভয় তোর আছে তা হলে? শুনে সোয়াস্তি পেলাম।

খপ করে মণিলালের হাত এঁটে ধরে ছটা জলের দিকে টানে। বলে, চারো ঝেড়ে আনিগে চল্। কুয়োর ধারে কাঠশোলা-ঝাড়ের মধ্যে মেলা চারো পাতে। সকালবেলা খালুই-ভরা মাছ নিয়ে যায়, নিত্যিদিন দেখি।

মণিলাল হাত ছাড়িয়ে নিল। আবদারের সুরে ছটা বলে, চারিদিকে মাছে মাছে ছয়লাপ, বর্ষাকালে যারা ছিপ ফেলে ঘুন হয়ে বসে থাকে তারা সব গাড়োল—তুই-ই তো বলেছিলি। চারো-ঘুনসির মতলবও তোর।

তখন তোর প্রাইভেট-টিচার ছিলাম না, হাই ইস্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট-হেডমাস্টারও নই—

ছটা বলে, রাত্তিরবেলা মাস্টারিটা ছাড়লি না-হয় একটু। বাদাবনের সেই দু'জন আবার যেন হয়ে গেছি—কে দেখছে? ডোঙা রয়েছে, শোলাবনও ঐ ঝাপসা মতন দেখা যাচ্ছে। ক'টা ধুজি মারলেই গিয়ে পড়ব।

কণ্ঠ কাতর হয়ে উঠল। বলে, তুই লোভ ধরিয়ে দিলি—সেই থেকে এদিকে নজর আমার। লোকে কত কত চারো-ঘুনসি পেতে যায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। কি করব, সোমত্ত হয়ে গেছি নাকি—সর্বক্ষণ সবাই সামাল-সামাল করে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট-হেডমাস্টারও লোভাতুর হয়ে উঠল। সত্যিই তো, কে দেখছে?

কাঠশোলা-ঝাড়ও দূরে নয়। কাদা-টাদা ধুয়ে ফেললেই আবার যে-মাস্টার সে-ই। কে দেখছে!

তবু বলল, রাত্তিরে বাইরে ঘুরছিস—বাড়ির লোকে টের পেলে আস্ত রাখবে না তোকে।

বাড়ির লোক মানে তো মা। মশগুল হয়ে সে যাত্রা শুনছে। সৈরভী মায়ের সঙ্গে। বাড়ি আগলাচ্ছেন পিসিমা, সন্ধ্যে থেকে তাঁর নাক ডাকছে। পিসিকে নিয়ে আমার ভাবনা নেই।

ছটা বাড়ি ফিরল—মণিলাল ফিরে তাদের উঠোন অবধি পেঁাছে দিয়ে গেছে। রাধিকা তাঁর ঘরে তালা দিয়ে গেছেন। ভাবিনীর ঘরেও খিল আঁটা ভিতর

থেকে। তবে কায়দা আছে—বেড়ার ফুটোয় হাত ঢুকিয়ে ছটা খিল খুলতে পারে। বলেছিল ঠিকই—ভাবিনী নাক ডাকছেন। চোখও বন্ধ। কিন্তু হলে হবে কি, কান দুটো বিষম সজাগ। দাওয়ায় পা পড়তেই বাঘিনী চেঁচিয়ে উঠলেন : কে রে, কে ওখানে?

সাড়া না দিয়ে আর উপায় থাকে না।

ভাবিনী বললেন, এর মধ্যে এলি যে?

ভাল লাগছিল না পিসিমা।

বেড়ার ফুটোয় হাত ঢুকিয়ে খিল খুলতে হলো না, ভাবিনী নিজেই খুলে দিলেন। বললেন, এলি কার সঙ্গে?

মাস্টারমশায় বাড়ি যাচ্ছিলেন—তাঁকে বললাম। তিনি রেখে গেলেন।

চুপিসারে ঘরে ঢুকে মাদুর নিয়ে গড়িয়ে পড়বে ভেবেছিল। ফাঁক মতন কাপড় বদলে নেবে। দিনমানে ভালমানুষ হবে : পিসির কাছে ছিলাম আমি রাত্রে।

মতলবটা এই। সমস্ত বরবাদ—খস করে ভাবিনী টেমি জ্বাললেন।

কাদা মেখে ভূত হয়েছিস যে! ভিজে সপসপ করছে।

পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম পিসিমা।

পড়ে এমনিধারা হবে কেন? কাদায় জলে গড়াগড়ি খেয়েছিস। কি হয়েছে, বল্—

পরদিন বিকালে মণিলাল যথারীতি পড়াচ্ছে।

পড়াশুনো মানে তো নিষ্কর্মা হয়ে ঘরের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকা—ভাবিনী তাই বোঝেন। ঝাঁটা মারো অমন জিনিসের মুখে! তিনি এ ঘরের ছায়াও মাড়ান না কখনো। আজকে ঝড় তুলে ঘরে ঢুকলেন।

ছটা সোমত্ত হয়েছে না?

মণিলালের কপালে ঘাম ফুটেছে : হয়েছেই তো—

রাতে কাল কি হয়েছিল, বল্—

ধ্বকধ্বক আগুন জ্বলছে বৃদ্ধার দুচোখে। ছবিতে বিশ্বামিত্র মুনির যেমন দেখা যায়। মণিলাল হতভম্ব হয়ে আছে।

ভাবিনী গর্জে উঠলেন : সত্যি কথা বল্ যদি বাঁচতে চাস। নয়তো ঝাঁটা-পেটা করব, মাস্টার বলে রক্ষে হবে না।

মিথ্যে মণিলালের মুখে এমনিই আসে না—ও বিষয়ে ওস্তাদের ওস্তাদ পিসির ভাইঝিটি। বলল, আমার দোষ নেই পিসিমা, কিচ্ছু আমি জানতাম না। কাদা বাঁচিয়ে একা একা বাড়ি ফিরছি—বাঁকা-তালগাছ অবধি গেছি, আচমকা গায়ে কাদা ছিটিয়ে টের পাইয়ে দিল, এতক্ষণ পিছু পিছু আসছিল। রাত্তির-বেলা মাঠের মাঝখানে তখন কি লাঠালাঠি করব?

ভাবিনী কিছু নরম এখন। বললেন, লাঠি নিয়ে চলিসনেও তো তোরা—

চললেই বা কি। লাঠি দূরস্থান—সোমত্ত মেয়ে, মুখের হাঁকডাকেরও উপায় নেই। লোক-জানাজানি হবার ভয়। ছটা জো পেয়ে গেছে—অ্যাসিস্ট্যান্ট-হেডমাস্টার মানুষ আমায় দিয়ে শোলাবন অবধি ডোঙা বাইয়ে তবে ছাড়ল।

ছটা এতক্ষণে এইবার কলকল করে কৈফিয়ত দেয় : শোলাবনে চারো পাতে পিসিমা, নাকি মেলা মাছ পড়ে। ভাবলাম দেখেই আসি, সত্যি না মিথ্যে।

মণিলাল ওদিকে বলে যাচ্ছে, শোলাবনে না গিয়ে, পিসিমা, ডোঙা থেকে ঝপ্‌পাস করে লাফ। সাপের আড্ডা ওখানে। তা আমি কি করব—সোমত্ত মেয়ে হয়ে পড়েছে, টেনে ধরতে পারিনে।

ভাবিনীর এখন উল্টো সুর। বললেন, মাছ ধরা কী জিনিস জানিসনে তো। সাপের ভয়-টয় তখন থাকে না।

মণিলাল বলছে, চারো তুলে তুলে ডোঙায় ঝাড়ছে। পচা কাদা মেখে তখন যা চেহারা—

মাছ ধরতে গিয়ে কাদা লাগবে না—তুই কী রে!

আজেবাজে কথা ছেড়ে ভাবিনী বৈষয়িক প্রসঙ্গে এলেন। ছটাকে প্রশ্ন : চারো ঝাড়লি, মাছ কি হলো?

ছটা বলে, দু'জনে যখন গেছি, কাজের কম-বেশি দেখতে গেলে হয় না—সমান সমান দুই ভাগ। ভালো করিনি পিসিমা?

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে ভাবিনী বললেন, তোর ভাগ কোথায় গেল?

সেটাও মাস্টারমশায়কে দিয়ে দিলাম।

ভাবিনী ভ্রূকুটি করলেন : কেন?

নইলে সবাই টের পেয়ে যেত। মায়ের মেজাজ তো জানো—চুলের মুঠি ধরত আমার।

ভাবিনী বলেন, আ আমার নবাব-নন্দিনী! মা গুরুজন—একটু চুলের মুঠি ধরল তো ঝুরঝুর করে বুঝি চুল থেকে হীরে-মুক্তো পড়ে যেত! মুখের মাছ এই জন্যে তুই দান করে এলি? আগে তো এমন ভীতু ছিলিনে!

ছটা বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে, সোমত্ত হয়ে গেছি যে! ঘড়ি-ঘড়ি তোমরা কানের কাছে শোনাচ্ছ, কি করব?

শোনাচ্ছি বলেই কি মুখের জিনিস ফেলে আসতে হবে? চুল ধরার ভয় করিস তুই—ছিঃ।

ভাইঝিকে ছেড়ে ঝাঁজ এইবারে মণিলালের উপর : তোর আক্কেলও বলিহারি যাই। নিজের ভাগটাও যখন দিয়ে দিল, আজ দুপুরে নেমন্তন্ন করলিনে কেন? সে মায়াদয়া থাকলে তো! বেহায়া বেয়াক্কিলে স্বার্থপর। একা একা তাহুন্দ সেঁটেছিস, ওর অদৃষ্টে জুটেছে ডাঁটাচচ্চড়ি আর ভাত।

গোলপাতা বোঝাই সাঙড়নৌকো যাচ্ছে চুমকুড়ি গাঙের উপর দিয়ে। ভরা জোয়ার, পিঠেন বাতাস। চারখানা দাঁড়ের দুটো মাত্র নামিয়েছে—নৌকো তরতর করে যাচ্ছে মাঝগাঙ দিয়ে।

পাশখালি দিয়ে হুশ করে এক টাপুরে বেরিয়ে পড়ল। শৌখিন কোন বাবুভেয়ে সদলবলে শিকারে চলেছেন, মালুম হচ্ছে। বাদাবনে এমন অনেক যায়। দলপতি বাবুটির বন্দুকের আওয়াজে হয়তো ভিরমি লাগে—দু'কানে আঙুল ঢুকিয়ে নৌকোয় তিনি শুয়ে থাকেন, লোকজন বনে নেমে শিকার করে আনে। কিন্তু মানবেলায় ফিরে শিকারের সবখানি বাহাদুরি কিন্তু বাবুমশাই একলাই নিয়ে নেবেন—হরিণের শিঙেল মাথা তাঁর দেয়ালে নিয়ে আটকাবেন।

টাপুরের মাল্লা সাঙড়ের উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়ছে : কলকেডার মাথায় এট্টু আগুন দাও দিনি। দেকাঠি ভিজে গেছে, ধরানো যাচ্ছে না।

সাঙড়ের গ্রাহ্য নেই, বেয়েই যাচ্ছে।

শিকারী নৌকোর উগ্রকণ্ঠ : কানে নেচ্ছ না যে?

কানে নিলি উজোন ঠেলতি হবেনে এর পরে—

এবং নাইয়াদের মাঝে কি চোখাচোখি হলো—যে দুটো দাঁড় তোলা ছিল, তৎক্ষণাৎ নামিয়ে নিয়ে ঝপাঝপ মারতে লাগল। বোঝাই সাঙড় উড়ে চলল যেন। শিকারী নৌকোও কম যায় না। পাল্লাপাল্লি দুয়ের মধ্যে—নৌকো-বাইচের সময় যেমন হয়। হঠাৎ দেখা যায়, বাবুভেয়ে মানুষটি চকিতে সাজবদল করে সাহেব হয়ে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়েছেন। পেট্রোল-অফিসার—চলতি কথায় যাকে পিটেল সাহেব বলে। শিকার না ঘোড়ার ডিম—ছদ্মবেশে এরা বাদার অন্ধি-সন্ধি ঘুরে পাহারা দিয়ে বেড়ায়।

পিটেল বন্দুক তাক করে গর্জন ছাড়ে : কাছে আয়, নৌকো পাশে এনে লাগা। তল্লাশ হবে।

অকুতোভয় গোলপাতা-ব্যাপারী বলল, তা করেন না তল্লাশ—একবার ছেড়ে দশবার করেন। ধর্মপথে কাজকারবার—জুয়োচুরি-ফেরেব্বাজির মুখে মারি ঝাড়ু। আসতি আজ্ঞে হয় হুজুর, উঠে আসেন—

আসার সুবিধা হবে বলে তক্তা ফেলে দিল দু'নৌকোর মাঝে, বাঁশের ধ্বজির এক মুড়ো এ-নৌকোয় একজনে ধরে দাঁড়াল, আর এক মুড়ো অন্য নৌকোয় আর একজন। বলে, বাঁশ ধরে ধরে আসেন তক্তার উপর দিয়ে।

শিকারী মল্লারা পাগড়ি-চাপরাস পরে ইতিমধ্যে ষোলআনা কনস্টেবল। পিটেলের পিছু পিছু তারাও সব উঠে এল। ব্যাপারী সকাতরে দরবার জানায় : কাজ সারে এট্টু ঝটপট ছাড়ে দেবেন হুজুর। নয়তো উজোন ঠেলে মরতি হবেনে! জায়গাডা আবার ভাল না।

খাতির করে জলচৌকি দিল সাহেবের বসার জন্য। ব্যাপারী পায়ের কাছে বসে হাতবাক্স খুলে কাগজপত্র বের করে দিল। পাতা-কাটার পাশ আছে

যথাবিধি। নৌকোর মাপেও কোনরকম হেরফের নেই।

পিটেল সাহেব বলে, পালাচ্ছিলে কেন তবে অমন করে? পালানো দেখেই তো সন্দেহ হলো।

ঝড় কেটেছে বুঝে একগাল হেসে ব্যাপারী বলে, সাহেবসুবো দেখলি আমারগে গা কাঁপে। হুকুম দিয়ে দেন, নৌকো ছাড়ি এবারে।

যাবে তো বটেই। এ জায়গা আবার গরম (ব্যাঘ্রসঙ্কুল) খুব—ঘোর না হতে সরে পড়।

বলছে পিটেল, কিন্তু ওঠার গতিক নয়। একজনের দিকে চোখ টিপে দিয়েছে, টাপুরেয় গিয়ে সে গোটাকয়েক লোহার শিক নিয়ে এল। গোল-পাতার আঁটির মধ্যে শিক ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে খোঁচাচ্ছে চার-পাঁচ জনে—এঁদো-পুকুরের হাবড়ে লাঠি ঠুকে ঠুকে যে কায়দায় কচ্ছপ খোঁজে। যা ভেবেছে তাই--

পিটেল হেসে বলল, গোলপাতা জমে গিয়ে নিরেট হলো নাকি? আঁটি তোল, দেখি সে কেমন।

গোলের আঁটির ভিতরে মূল্যবান সুঁদুরকাঠ।

পাতার মধ্যে বড় বড় কাঠ এমনি এমনি ঢুকে যায় না। সদর থেকে তলব এল—আসবেই, মধুসূদন জানতেন। হাতেনাতে পেয়েছে, মুখুজ্জে রক্ষে রাখবে না।

আধময়লা কাপড়, ছেঁড়া জামা, তালি-দেওয়া জুতো-ছাতা এক প্রস্থ আলাদা করে তোলা থাকে। উপরওয়ালার কাছে যাবার পোশাক। সেই পোশাকে মধুসূদন মুখ কাচুমাচু করে মুখুজ্জের সামনে দাঁড়ালেন।

ঘেরির গাছ গোলপাতার মধ্যে সেঁদোয় কি করে?

অসুখে পড়েছিলাম স্যার, পাঁচ-সাত দিন মাথা তুলতে পারিনি। বাজে লোক দিয়ে কাজকর্ম—তার মধ্যে কখন কাণ্ডটা ঘটে গেছে।

মুখুজ্জে বলেন, অসুখ তো লেগেই আছে আপনার। নৌকোর মাপের হেরফের বেরুল একবার, তখনও বলেছিলেন মাথা টনটন করছিল বলে লেখার গণ্ডগোল হয়ে গেছে।

মধুসূদন সপ্রতিভ কণ্ঠে বলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, অসুখ আরো একবার হয়েছিল বটে।

কতবার হয়েছে! ক'টা হিসেব পেঁছিয় আমাদের কাছে?

হাসতে হাসতে মুখুজ্জে আবার বললেন, বাদাবনে আপনার শরীর টিকছে না। কাজ ছেড়ে দেশে-ঘরে গিয়ে এবার শরীরের যত্ন নিন।

মধুসূদন কাকুতিমিনতি করছেন : এইবারটা মাপ করে নিন। অসুখবিসুখ আর হবে না, এই শেষ।

মুখুজ্জে বলেন, তাহলে চলবে কিসে? সরকার যা দেয়, সেই ক'টি টাকা নিয়ে জঙ্গলে পড়ে থাকা পোষায় কারো? ভালো কথাই বলছি ঘোষমশায়,

আপোসে চাকরি ছেড়ে মানে-মানে চলে যান, কোনরকম গণ্ডগোল হবে না। চাকরি কদ্দিন হলো?

বিড়বিড় করে একটু হিসাব করে নিয়ে মধুসূদন বললেন, বারো বছর—

বেশ তো হলো। বারো বছর নিরঙ্কুশ রাজ্যভোগ হলো, এবারে অন্য লোক আসুক। একলা চিরকাল আঁকড়ে থাকবেন, সেটা স্বার্থপরের মতন কথা। অন্যেরা তবে যায় কোথায়?

॥ তের ॥

বরখাস্ত হয়ে মধুসূদন মুলটি এসে উঠলেন। বুক ফুলিয়ে সকলের কাছে দেমাক করেন : এক যুগ—বারো বচ্ছর বনকরে কাটিয়ে এলাম—কে পারে? চার বছর পাঁচ বছর—এমনিই তো সব। লাগেও না তার বেশি। তেমন তেমন করিতকর্মা হলে ওরই মধ্যে যা করবে—নিজের বাকি জীবন পায়ের উপর পা দিয়ে বসে কাটাবে, ছেলেপুলের সংস্থান রেখে যাবে—তাদের ছেলের, তাদের নাতিরও। এই না হলে মানুষ বাঘ-কুমিরের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে নোনাজল খেয়ে পড়ে থাকতে যাবে কেন? আমার কেমন জেদ চেপে গিয়েছিল—কদ্দিন থাকা যায় দেখি। বারো বছর থেকেছি—এটা রেকর্ড। চাকরির মেয়াদ সম্পূর্ণ শেষ করে পেন্সনভোগী হয়ে ঘরে বসব, সে আশা কখনো করিনি—এসব চাকরিতে কেউ তা করে না।

চাকরি নেই, উপরওয়ালার কানভারী করবে সে শঙ্কাও নেই—ছেঁড়া জামা, তালিমারা জুতো ইত্যাদি আঁস্তাকুড়ে গেছে—মধুসূদনের পরনে এখন ফিন-ফিনে শান্তিপুরে ধুতি, গায়ে সিল্কের গেঞ্জি। তিনটে পাঁজা পুড়িয়েছেন, বাড়িতে দালানকোঠা হবে। এক পুরানো আড়তদারের সঙ্গে যথাযথ বন্দোবস্ত ছিল—বাদার আমদানি একভরা সুঁদুরে ও গরানকাঠ এসে পড়ল। পাকাবাড়ির আগে মধুসূদন আটচালা ও ছ'চালা ঘর তুললেন, তার যাবতীয় আড়াখুঁটি সুঁদুরকাঠের, বেড়া গরানের। তল্লাটে রৈ-রৈ পড়ে গেল—বরখাস্ত হয়ে মধুসূদন ঘোষ বাড়ি এসে উঠেছেন, আসল মূর্তি প্রকাশ পাচ্ছে এতদিনে।

ইস্কুলের পর বিকালবেলা মণিলাল যথারীতি পড়াতে এসেছে। বই-খাতা নিয়ে ছটা আজ অপেক্ষায় আছে। লেখাপড়ায় এতদূর নিষ্ঠা—বলি চাঁদ-সূয্যি আকাশে উঠছে তো ঠিক ঠিক?

মণিলাল অবাক হয়ে বলে, হলো কি রে?

বাইরের দিকে চোখ ঘুরিয়ে ছটা ফিসফিস করে বলে, বাবা কলকাতায় গিয়েছিল না—ফিরে এসেছে, বাড়িতেই আছে এখন।

একটি মানুষকে সমীহ করিস তবে দুনিয়ায়? মেসোমশায়ের ভাগ্যি অনেক।

লেখাপড়াটা কিন্তু ভিন্ন গরজে। খবর রাখে না মণিলাল। ছটা টিপে টিপে হাসছে।

মণিলাল বলে যাচ্ছে, অন্যদিন সাড়াই পাইনে। ডাকতে ডাকতে তারপরে

এলি তো ধপ করে বই ছুঁড়ে দিয়ে দশ হাত দূরে বকের মতন ঘাড় উঁচু করে থাকিস।

ছটা বলে, বলছি তো তাই। এক কাণ্ড ঘটিয়ে এসেছে বাবা। ফাঁড়ার মুখে পড়েছি—ফাঁড়া কাটানোর জন্যে আমিও মরীয়া—

আরও গলা নামিয়ে বলল, আমায় দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে কলকাতায় ছোট-মামার বাসায়। বিরাট সম্বন্ধ—পাত্তোর হবু-ইঞ্জিনিয়ার। প্রায় গেঁথে ফেলেছে বাবা। সকলের গোড়ায় তারা নাকি জিজ্ঞাসা করেছে, মেয়ের লেখাপড়া কদ্দুর? মেয়েছেলের যেন অন্য কিছু লাগে না—শুধুই লেখাপড়া। বাবা বলে এসেছে, পাশ-টাশ না হলেও বাংলা আর ইংরাজি এ দুটো খুব ভালো রকম রপ্ত আছে। বলে এখন আমায় চুমরাচ্ছে : চেষ্টা করলে তোর অসাধ্য কিছু নেই। গড়িয়ে গড়িয়ে দুটো তিনটে মাস ঠেলে নিয়ে যাবো—লেগে যা তুই প্রাণপণে। তাই লেগেছি—ইঞ্জিনিয়ার বর পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়, কি বলিস?

মণিলালও ভরসা দেয় খুব। বলে, ঘাবড়াসনে—আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। একটু যদি মন দিস, তোর সঙ্গে কে পারবে? পাশ-টাশ নয়, বলে এসেছেন তো মেসোমশায়—ম্যাট্রিক পাশ করিয়ে দেবো তোকে, ফার্স্ট ডিভিসনে। দুটো বছর সময় দিন আমায়।

দুটো বছর! মুখে কাপড় দিয়ে ছটা হাসতে লাগল। বলে, দু-বছরে তো গিন্নি আমি দস্তুরমতো। এক বাচ্চা কাঁখে, এক বাচ্চা বুকে নিয়ে বাপের বাড়ি এসেছি। কপালে এ্যাব্বড়ো মাটির ফোঁটা, বাঁ-হাতে পেঁচো-পাঁচির মাদুলি। পাশ-করা যদি হতামও, সে-পাশ ততদিনে অন্তর্জলীতে ঢুকে যেতো।

খুক-খুক খিল-খিল হাসি।

এইও—বলে কর্তব্যনিষ্ঠ মণিলাল নড়েচড়ে ভাল হয়ে বসল। 'রয়াল রিডার' মেলে ধরে বলল, একটি বাজে কথা নয়—বাংলা কর্ এইখানটা।

খাতা নিয়ে ঘাড় হেঁট করে ছটা করছে তাই। পুরানো ভূতটা হঠাৎ ঘাড়ে চাপে। কলম ছুঁড়ে দিয়ে মণিলালের দিকে চেয়ে বলল, কষ্ট হচ্ছে না তোর?

মণিলাল ফোঁস করে উঠল : পড়া আরম্ভ হয়ে গেছে—এখনো তুই-তোকারি?

মাস্টারির কিছু নয়—তাহলে 'আপনি'ই বলতাম। হঠাৎ তুই গম্ভীর হয়ে গেলি—কি ভাবছিস বল্। সত্যি বলবি।

মণিলাল বলল, ছবিটা নিয়ে উঠেপড়ে লাগতে হবে এবার।

কিসের ছবি?

তোর একটা ছবি করছি না—যত্ন করে করছি বলে সময় লাগছে। শেষ করে ফেলে তোর বিয়ের উপহার দেবো সেটা।

বড্ড যে খুশি তুই—

মণিলাল বলল, খুশি তো বটেই। ভাল ঘরে যাচ্ছিস, ইঞ্জিনিয়ার বর। ভাল খাবি, ভাল পরবি—

ছটা লুফে নিয়ে বলল, আর নেমন্তন্নে তুইও একদিন ভাল খাবি—তোর

সেই আনন্দ।

তোর বিয়ের শুধু একদিনের একটা খাওয়াতেই শোধ যাবে নাকি? হপ্তা-ভোর খাবো।

এবম্বিধ পড়াশুনো ঘরের মধ্যে ঘোর বেগে চলছে—কান দুটো তীক্ষ্ণ করে মধুসূদন বাইরে পায়চারি করলেন কিছুক্ষণ। মিনমিনে যৎসামান্য আওয়াজ, স্পষ্ট কিছু নয়। পড়ানোটা ঠিক আদর্শস্থানীয় বলে মনে হচ্ছে না তাঁর।

নিরিবিলি রাধিকাকে বললেন, মাস্টার রাখলে—তা বুড়োহাবড়া একটা মিলল না?

রাধিকা বললেন, ছটার পুরানো মাস্টার তো—

বাদাবনে যা চলে, মানষেলায় তা চালাবে? বোটের মাঝি সেখানে তো গলায় ফেটির সুতো ঝুলিয়ে পুরুতঠাকুর হয়ে বসে, কুড়ুল-মারা কাঠুরে ন'সিকের হোমিওপ্যাথি বাক্স কিনে জাঁদরেল ডাক্তারবাবু। না পেলে উপায় কি? দুপুরে মণিলাল চাট্টি চাট্টি খাচ্ছে তো খেয়ে যাক—তার বেশি জড়িও না। খবরদার, খবরদার—প্রেম-ট্রেম ঘটে গেলে পস্তাবে তখন।

রাধিকা উড়িয়ে দিলেন: দূর, চুলোচুলি দুটোর মধ্যে। আমিই বুঝিয়ে-সুজিয়ে বকেঝকে ঠাণ্ডা রাখি।

মধুসূদন চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লেন: না গো, গতিক ভাল ঠেকছে না। এক মেয়ে আমাদের, সুপাত্রে দেবো, প্রায় বন্দোবস্ত করে ফেলেছি—বরবাদ না হয়ে যায়। সাতকড়ি গার্ড হয়ে আমারই তাঁবে ছিল, বেহাই হয়ে সেই মানুষ কোলাকুলি করবে—

বলতে বলতে আগুন হলেন: নিমকহারাম শয়তান—নিজে আমার চাকরিটা নিয়েছে, আবার ভাগনেটা টুইয়ে দিয়েছে, মেয়েটাও যাতে নিয়ে নেয়।

কর্তার কাছে রাধিকা নস্যাৎ করলেন, মনটা কিন্তু সেই থেকে ভারী হয়ে আছে। মণি শেষটা জামাই হয়ে আসবে? এমন নাকি আকচার হচ্ছে—মেয়ে আর অজানা-অচেনা ছোঁড়া হাত-ধরাধরি করে এসে পায়ের গোড়ায় ঢপাঢপ গড় করল। মেয়ে বলে দিচ্ছে, মা, তোমার জামাই। বিয়েথাওয়া সারা করে যুগলে দর্শন দিতে এসেছে।

সেইদিনই শোনা গেল, এগজামিনের ফল বেরিয়েছে—মণিলাল ফেল। রাধিকা আর স্থির থাকতে পারেন না, দোর্দণ্ডপ্রতাপ ভাবিনীর শরণাপন্ন হলেন: মণিলালের যা অবস্থা—ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। বি. এ-টাও ফেল হয়ে বসে আছে। হিত করতে গিয়ে বিপরীত করলাম নাকি ঠাকুরঝি? ভালোর তরে পড়াতে দিলাম—তোমার ভাই বলছেন, মেয়ে প্রেমে পড়ে গেছে।

হাল আমলের এই সব গোলমেলে জিনিস ভাবিনী বুঝে উঠতে পারেন না। বললেন, কিসে পড়ে গেল?

রাধিকা খুব প্রাঞ্জল করে বললেন, মণির উপর ছটার নাকি টান পড়ে গেছে।

ভাবিনী বললেন, পড়বে না কেন? এ্যাদ্দিনের জানাশোনা আসা-যাওয়া—বলি, তোমার পড়েনি? নইলে উপোস করুক যা-ই করুক, তুমি যেচে কেন খাবার কথা বলতে গিয়েছিলে?

বলে ভাল করিনি বোধহয়। তোমার ভাই বলছিলেন তাই। দুটোর মধ্যে বিয়ে হয়ে গেলে তো সর্বনাশ!

ভাবিনী চমক খেয়ে বললেন, হলেই হলো! দিতে যাচ্ছে কে বিয়ে?

প্রেম হলে তখন আর দিতে হয় না ঠাকুরঝি। নিজেরাই করে ফেলে।

প্রেম, প্রেম, প্রেম—বার কতক বলে বলে হাল আমলের নতুন কথাটা ঠাকরুন রপ্ত করে নিলেন। সহসা দন্ত-কিড়মিড় করে উঠলেন: প্রেমের নিকুচি করেছে। চুলের মুঠো ধরে পাক দেবো না তাহলে? ঝাঁটাপেটা করব না আগাপাস্তলা?

গিয়ে পড়লেন তখনই ছটার উপর: চৌকিদারের ভাগনেটা ফেল হয়েছে—তারই সঙ্গে তুই প্রেম করলি?

ছটা আকাশ থেকে পড়ে: মিছে কথা। কে বলল পিসিমা? একদম মিছে।

তবে ওটাকে এলাকাড়ি দিস কেন?

কাজ পাই বলে। একটা-কিছু বললে মুখের কথা মুখে থাকতে করে দেয়। ধরো না, সেদিনের সেই ঘুরকুট্টি আঁধারে ডোঙা বেয়ে শোলাবনে চারো ঝাড়তে যাওয়া। যাদের চারো, টের পেলে মেরে ভূত ভাগাত—মাস্টার বলে খাতির করত না। এক কথায় সেখানে নিয়ে তুলল—অমন কে করে বলো? সাতু-জেঠা করতেন, জঙ্গলে দেখেছি—সরকারি চাকরি তিনি। আর, মাস্টারমশায় হলো আমাদের চাকর বিনি-মাইনের।

প্রণিধান করলেন ভাবিনী। তবু একবার জিজ্ঞাসা করেন: ঠিক তো রে? আর কিছু নয়?

আর কি বলতে চাও পিসিমা?

পিসি বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, আমি নই—বলে তোর মা-বাবা। বড্ড ফুসফুস-গুজগুজ করিস—তাই বলছে প্রেম-ট্রেম হলো কিনা।

হি-হি-হি—। ছটা তো হেসেই খুন। বলে, পোড়াকপাল, আর মানুষ পেলাম না! বাড়ি বলতে চারপোতার মধ্যে চালাঘর খান দুই। ইস্কুলের মাস্টার হয়েছে, সে ইস্কুল মাইনে দেয় না। দূর, দূর—

পুলকিত ভাবিনী আরও ধরিয়ে দিচ্ছেন: মধুর চাপরাসী ছিল ওর মামা সাতকড়ি—চাপরাস এঁটে টুলে বসত—

ছটা একটানা বলে যাচ্ছে, হাটবাজার করতেন, কাঠ ভাঙতেন, জঙ্গলে জঙ্গলে পাহারা দিয়ে ঘুরতেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি পিসি। যাচ্ছি তাঁর ভাগনে-বউ হতে! সাতজন্ম বিয়ে না হলেও নয়।

ভাবিনী সায় দিয়ে বললেন, আমিও তাই বলছিলাম। প্রেম করে আখের খোয়াবে, ছটা আমাদের তেমন মেয়ে নয়।

ছটার বলার এখনো বাকি : শুনেছি পিসিমা, কায়েতও নয় ওরা। দত্ত উপাধি কত জাতেরই হয়ে থাকে। জাত ভাঁড়িয়ে কায়েত হয়ে আছে ওরা। বিয়ে হলে তো ভিন্ন জাতের হয়ে যাবো পিসিমা, তোমরা আমার হাতের জলটুকুও খাবে না।

ভাবিনী গিয়ে ভাই-ভাজের কাছে দেমাক করেন : আমার সঙ্গে ওঠা-বসা ওর, আমার কাছে শিক্ষাদীক্ষা। নির্ভাবনায় থাকো, প্রেম-ট্রেমের মধ্যে যাবার মেয়ে ছটা নয়।

মেয়ের বিয়ের জন্য মধুসূদন বড্ড ব্যস্ত হয়েছেন। নশ্বর জগৎসংসার, আজ আছি তো কাল নেই—ল্যাঠা চুকিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত। ঘটক লাগিয়েছেন, আপন পর যাকে পাচ্ছেন বলছেন। সম্বন্ধ আসছেও। গোটা চার-পাঁচ তার মধ্যে মনে ধরল।

রাধিকার তিন ভাই—বিমল কমল অমল। সকলের ছোট অমল খবরের-কাগজের রিপোর্টার, কলকাতায় বাসা করে আছে। মধুসূদন তার কাছে গিয়ে পড়লেন। পছন্দের পাত্র কলকাতায় যে ক'টি আছে, শালা-ভগ্নিপতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন তাদের, যাবতীয় খবরাখবর নিলেন। একটি তার মধ্যে তারাপদ। বড় পছন্দসই। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে, চেহারায় রাজপুত্র। আই. এসসি-তে বেশ ভাল করেছিল, বিনা তদ্বিরে তাই ঢুকতে পেরেছে। বাপ নেই। জেঠা হিন্দু-য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক, কাশীর পাকা বাসিন্দা হয়ে পড়েছেন। তারাপদর পড়ার খরচা তিনিই চালিয়ে যাচ্ছেন নিজ সংসারের প্রচুর অসুবিধা ঘটিয়ে।

বাড়ি ফিরে মধুসূদন স্ত্রীর কাছে সবিস্তারে সব বললেন। মেলা ঘোরা-ঘুরির দরকার নেই। মেয়েটা দেখিয়ে দিয়ে কাজ ঐখানে পাকা করে ফেলি। কেমন?

রাধিকা সংশয় তোলেন : ছেলে লেখাপড়ায় অত ভালো, আর তোমার মেয়ের তো 'ক' লিখতে কলম ভাঙে। তাই নিয়ে কথা উঠবে না?

সকলের গোড়াতেই তো সেই কথা। পাত্রের মা মেয়ের লেখাপড়ার কথা তোলেন, কানে না নিয়ে আমি কেবল পণের অঙ্কটা শোনাই। পড়া চাপা পড়ে টাকার কথাই শেষটা চলল।

রাধিকা পুনরপি বলেন, ছেলের রং ধবধবে বলছ। মেয়ের রং নিয়েও খুঁত-খুঁতানি হতে পারে।

মধুসূদন ঘাড় নেড়ে বললেন, হবে না। জবর টোপ ফেলে এসেছি—টাকাতেই মেয়ের গায়ের রং ধবধবে করে দেবে।

একটু থেমে আবার বললেন, তা সত্ত্বেও এলাকাড়ি দিও না। মেয়ে দেখাতে কলকাতায় যাবো পুজোর পর। আচ্ছা করে তদ্দিন সাবান ঘষাঘষিতে লেগে যাও তোমরা। আর মণিলালও লেখাপড়া যতটা পারে সড়গড় করে দিক।

পাত্রের মাকে 'বেয়ান' বলেও ডেকে এসেছেন এক-আধবার। বুঝিয়েছেন : হীরের টুকরো ছেলে, পরীক্ষা দিলে নির্ঘাৎ পাশ। যেমন-তেমন পাশ নয়—ফার্স্টক্লাস পাওয়াই সম্ভব। তবে সেই অবধি টেনে নিয়ে যাওয়া নিয়ে কথা। আপনার ভাশুরমশায় মহাপ্রাণ মানুষ জানি, কিন্তু খরচাও তাঁর বিস্তর। পড়ানোর ভারটা আমার উপরে দিন। সম্পূর্ণ টাকা হিসেব করে অগ্রিম দিয়ে দিচ্ছি—গাঙ পার হয়ে কুমিরকে কলা দেখানো আমার নিয়ম নয়। মেয়ে আমার সাত নয় পাঁচ নয়—ঐ একটি।

তারাপদর মা খুশি হয়ে মেয়ে দেখানোর ব্যবস্থা করতে বলেছেন। কয়েকটি আত্মীয়জন নিয়ে বেয়ান নিজে দেখবেন, ইচ্ছে হলে ছেলেও দেখতে পারবে। মেয়ে কলকাতায় নিয়ে দেখালে সুবিধা হবে। অমলের বাসা রয়েছে—এ-পক্ষেরও অসুবিধা নেই। বেয়ান কিন্তু কারো বাসায় আসতে চান না। তবে? দক্ষিণেশ্বরেই ভালো। মায়ের বাড়ি ওঁরা পুজো দিতে আসবেন, এ তরফের এঁরাও গিয়ে পড়বেন সেইদিন। মন্দির, গাছপালা, গঙ্গা—মেয়ে দেখানোর পক্ষে অতি উপাদেয় স্থান।

যে আজ্ঞে—। বলে মধুসূদন সায় দিয়ে এসেছেন। পাত্রপক্ষ যা বলে ঘাড় হেঁট করে 'হাঁ' দিতে হয়। আবার আসুক না আমাদের দিন—রুদ্রেশ্বর (রাধিকার ছ'মাসের ছেলে) বড় হোক, আমরা তখন হিমালয়ের চূড়ায় তুলে কিংবা কুমারিকার জলে নামিয়ে মেয়ে দেখাতে বলব।

॥ চোদ্দ ॥

কলকাতা-রওনা হচ্ছেন—রাধিকা বললেন, আমিও যাই। নয়তো হনুমান-মেয়ে সামলাবে কে? যত বয়স হচ্ছে, আরও যেন বাড়িয়ে দিচ্ছে।

অমলের বউ মীরা, এক বাচ্চার মা। বিয়ে খুব বেশিদিন হয়নি, হাসিখুশি বউটি। দক্ষিণেশ্বর গিয়ে মন্দিরের বাইরে বাগানে সবাই বসেছেন। কনে দেখতে তারাপদর মা এইখানটা আসবেন—এসে পৌঁছননি এখনো।

আগ-ডালে সুতো জড়িয়ে একটা ঘুড়ি ছিঁড়ে আছে। ছটা বলে, ওদের আসার এখনো ঢের ঢের দেরি। ঘুড়িটা পেড়ে আনি ছোটমামী।

রাধিকা তাড়া দিয়ে উঠলেন : এইও—

ওরা আসতে না আসতে আমি নেমে পড়ব। দেখ না—

কতক্ষণ ধরে কত যত্নে মীরা সাজিয়ে-গুজিয়ে এনেছে—এখন সে জুতো খুলে গাছের ডালে ঝুল খেয়ে পড়ল। রাধিকা গর্জে উঠলেন : মেরে তক্তা বানাব—বুঝবি ঠেলা। বিয়ের কনে বলে ছাড়ব না।

মীরা বলে, ক্ষেপাচ্ছে আপনাকে দিদি। সত্যি সত্যি উঠবে বুঝি? আপনিও যেমন!

ও না পারে, এমন কাজ নেই। তোমরা জানো না, আমি জানি। মেয়ের ধকলে হাড় আমার কালি-কালি হয়ে গেল।

না, মীরার কথাই ঠিক, গাছের ডাল ছেড়ে দিয়েছে ছটা। গঙ্গার দিকে কয়েক পা এগুল। মীরার দিকে ফিরে বলে, বানের গঙ্গাতেও আমি সাঁতার কাটতে পারি। সাঁতরে এক্ষুনি ঐ বেলুড়ের পাড়ে গিয়ে উঠব। হাসছ ছোটমামী, পারিনে বুঝি? বেশ, বাজি ধরো—

রাধিকা সন্ত্রস্ত হয়ে মধুসূদনকে বলেন, ক্ষেপে গেছে। দড়ি কিনে এনে আষ্টেপিষ্টে বাঁধো—নড়তে না পারে।

ছটা খিল খিল করে হাসে : সেই ভালো মা। বেঁধে মন্দিরের সামনে ফেলে রাখ—শুধু তারা কেন, যত লোক কালীদর্শনে এসেছে ভিড় করে এসে মেয়ে দেখবে। ইঞ্জিনিয়ারের মা যদিই বা গরপছন্দ করেন, অত লোকের মধ্যে কারো না কারো পছন্দে পড়ে যাব।

মধুসূদন টোপ ফেলে এসেছেন—অব্যর্থ সে টোপ, দেখা যাচ্ছে। তারাপদর মা কয়েকটি গিন্নিবান্নি সহ কনে দেখছেন—বাঃ-বাঃ করে তিনি কূল পান না।

ছটার যা দেখেন, যা-কিছু শোনেন, সমস্ত ভালো। বলছেন, বেশি ফর্সা ভালো নয়। নিজের পেটের ছেলে হলেও বলছি, একটু ময়লা-ময়লা হলে তারাপদকে বেশি ভাল দেখাত। মেমসাহেবগুলোকে দেখে আমার তো মনে হয়, গায়ে শ্বেতি উঠেছে।

ছটার গায়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বলেন, রঙে চেহারায় আমার এই মা'টিকে মানিয়েছে কেমন! লক্ষ্মীঠাকরুনের মতো বসে আছে—দেখে চোখ জুড়োয়।

মেয়েদের লেখাপড়া শেখা সম্পর্কেও তারাপদর মা, দেখা যাচ্ছে, অত্যন্ত অনুদার মত পোষণ করেন। নামটা সই করা, 'কেমন আছ' 'ভাল আছি' গোছের এক-আধখানা চিঠিপত্র লেখা এবং দুধের হিসাব, ধোপার হিসাব রাখার মতো বিদ্যা হলেই মেয়েছেলের পক্ষে যথেষ্ট। গাদা গাদা মেয়ে বি-এ এম-এ পাশ করছে, ওদের দিয়ে সংসারধর্ম হয় না। আমার বউমাকে নিচ্ছি ঘরগৃহস্থালীর জন্য, ট্যাং-ট্যাং করে অফিস করে বেড়ানোর জন্য নয়।

কাশীতে ভাশুরের কাছে তারাপদর মা চিঠি লিখবেন। সদাশিব মানুষ তিনি—বলেই দিয়েছেন, তোমাদের পছন্দে আমার পছন্দ। শুভকর্ম মাঘের গোড়ার দিকে হতে পারবে। বড়দিনের ছুটিতে কলকাতায় আসবেন তিনি, প্রয়োজনে ঐ সঙ্গে আরও মাসখানেকের ছুটি বাড়িয়ে নেবেন। যত যা-ই বলুন, আসলে তিনিই সব—চূড়ান্ত তাঁরই উপর নির্ভর করছে। হালের ফোটো একখানা বরঞ্চ দিয়ে যাবেন, কাশীতে পাঠিয়ে দেবো।

ফোটো নিয়ে আসেনি, মীরা সঙ্গে করে নিয়ে স্টুডিও থেকে খাসা করে ছবি তুলিয়ে আনল। ছবি দিতে গিয়ে মধুসূদন শুনলেন, তারাপদও গিয়েছিল সেদিন—মন্দির দেখে বেড়াচ্ছে, এমনিভাবে দূরে দূরে ঘুরছিল। হস্টেলে একবার মাত্র মধুসূদন দেখেছিলেন, ভিড়ের ভিতর তিনি ধরতে পারেননি। ছেলেরও অপছন্দ নয়। চৌঠা মাঘ আজামোজা এঁরা দিন ঠিক করে দিলেন। কাশীর কর্তা বড়দিনে এসে পাকাদেখা দেখবেন।

লাখ কথার নিচে নাকি বিয়ে হয় না। কথা শ'পাঁচেকও পুরল কিনা সন্দেহ, বিয়ে প্রায় ঠিকঠাক। মধুসূদনরা আরও কয়েকটা দিন কলকাতায় থেকে যাচ্ছেন, কাপড়চোপড় এবং হাল ফ্যাসানের দু-একখানা গয়নাগাঁটির সওদা হচ্ছে।

মীরার প্রশংসায় রাধিকা শতমুখ। মেয়েকে ডেকে ডেকে শোনান : সংসারের কাজকর্ম সব একহাতে করছে—তার মধ্যেও কী রকম ফিটফাট দেখ। নরমশরম চালচলন—বাড়ির মধ্যে মানুষ আছে বোঝাই যায় না। আর তুই চলিস—দত্যিদানো যেন দুনিয়া লন্ডভন্ড করে বেড়াচ্ছে। কথাবার্তার সময় মাথার ঝিঁটকি নাড়িয়ে দিস।

মীরাকে বললেন, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কী কান্ড করবে না-জানি। ভাবতে গেলে বুক শুকিয়ে আসে। তোমায় খুব ভালবাসে ছোটবউ, তুমি একটু ভাল করে সমঝে দাও ওকে।

ছটাই এসে বলল, তা কি কি আমায় করতে হবে, মহলা দিয়ে দাও

ছোটমামী।

মীরা লজ্জা পেয়ে বলে, তোমাদের গাঁয়েই কত বউ—এইবার গিয়ে তাদের চালচলন দেখো।

উ'হু, এড়িয়ে গেলে হবে না। মায়ের চোখ তোমার উপরে—ঠিক ঠিক তোমারই মতন আর একটা বউ হতে হবে। হাঁটব তো এমনি করে?

ঘাড় নিচু করে এক একখানা করে পা ফেলে মন্থরগমনে দালানের শেষ অবধি গেল। ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করে : হচ্ছে?

মীরা হাসছে। যা দেখাল, অতদূর অবশ্য নয়। তাহলেও গাঁ থেকে কয়েকটা দিনের জন্য বড় ননদ ও নন্দাই এসেছেন—কিছু বাড়াবাড়ি রকমের লজ্জা দেখানো হচ্ছে বই কি! তাই বলে কি অমনি?

ছটা বলে, এই রকম করতে হয়—না ছোটমামী?

মীরা নিম্নকণ্ঠে বলল, লোকের সামনে—

লোক যখন না থাকে?

কান মলতে হয় বরের।

যাও—

হয় রে। প্যান প্যান করেছ কি মরেছ—বরে একেবারে পেয়ে বসবে।

ছটাও তখন মীরার সুরে সুর মিলিয়ে বলল, ও কাজটা খুব পারব—

এবং বর বস্তুটির অভাবে—বাচ্চা মেয়ের পুতুলটা হাতের কাছে পেয়ে গেল—মোচড় দিয়ে তারই একটা কান ছিঁড়ে নিল। বলে, তুমি কান মলে থাক ছোটমামী?

মীরা বই কি- নইলে ঠান্ডা থাকে! কানটা তা বলে একেবারে ছিঁড়ে নিও না, লোকে বলবে ছটার কান-ছেঁড়া বর।

অমল কি-কাজে পিছন-দরজায় এসেছে, এরা দেখেনি। মীরাকে বলল, কি হচ্ছে?

তার আগে ছটাই কল কল করে নালিশ করছে : হ্যাঁ ছোটমামা, কান মলে ছোটমামী নাকি তোমায় ঠান্ডা রাখে? আমি বলছি, যাঃ, তাই কখনো হয়!

অমল সহাস্যে বলে, পাগলি ক্ষেপিয়ে দিচ্ছ তুমি? তামাসা বুঝবে না—যা মেয়ে, সত্যি সত্যি হয়তো ঐরকম করে বসবে।

মুলটি ফিরে গিয়ে বিয়ের গোছগাছ এইবারে। পাড়ার মানুষ গ্রামের মানুষের স্ফূর্তি· পিসি-ভাইঝির মন কিন্তু ভাল না।

ছটা বলে, আছি আর ক'দিনই বা!

আঙুলের কর গুণে সঠিক হিসাব দেয় : এক মাস সাতাশ দিন। দিন মোটে দাঁড়ায় না পিসিমা, সড়াক-সড়াক করে পালাচ্ছে।

গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে পিসি বোঝাচ্ছেন : বাপের-বাড়ির মেয়ে ছিলি,

শ্বশুরবাড়ির বউ হয়ে ঘরসংসার করগে এইবার।

ঝাঁকি মেরে মাথা সরিয়ে ছুটা ফোঁস করে উঠল : তুমি বলছ পিসিমা?

ভাবিনী বললেন, এর চেয়ে আনন্দের জিনিস—

শেষ করতে না দিয়ে ছুটা বলে, তোমারও এই কথা?

তড়াক করে উঠে শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে মুখ ঢেকে লম্বা ঘোমটা টানল। মীরার ঢঙে গুটিগুটি হেঁটে দেখায়। বলে, ও পিসিমা, দুটো মাস পরে এই দশা আমার।

কাঁদো-কাঁদো গলা। এ কী রে, চোখে সত্যি সত্যি যে জল। ছুটার চোখে জল—অদ্ভুত ব্যাপার। বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ি যাবার মুখে কোন কোন মেয়ে কাঁদে বটে—বিয়ের নামেই ছুটার কান্না।

কিন্তু ছুটা হেন মেয়ে বউ সেজে কতক্ষণ থাকবে! ঘোমটা নামিয়ে আঁচল কোমরে বাঁধতে বাঁধতে দৌড়। ও-দিগরে আর নেই।

অনতিপরে দেখা যায়, একপাঁজা মটরলতা বুকে নিয়ে বাড়িমুখো ছুটছে। আরও তিন-চারটে মেয়ে সঙ্গে। দয়াল মোড়ল তাড়া করেছে—পিছন দিকে দেখা যায়।

কি দয়াল, কি হয়েছে?—ভাবিনী মাঝে এসে পড়লেন।

দয়াল বলে, আমার কলাইক্ষেতে ওরা গিয়ে পড়েছিল।

শুঁটির লোভে গিয়েছিল। ক্ষেত থাকলে অমন যাবেই। সামনের মাঘে ছুটার বিয়ে, দু-মাসও আর নেই। খেয়ে নিক এই ক'টা দিন।

গাঁয়ের মেয়েটা বউ হয়ে যাচ্ছে, কোনদিন তখন ক্ষেতে যাবে না। তাকে আর কি বলবে—পান-তামাক খেয়ে হাসিমুখে দয়াল মোড়ল চলে গেল।

রাধিকা বলেন, তোমার সাহস পেয়ে আজকাল বড্ড বাড় বাড়িয়েছে ঠাকুরঝি। কাউকে গ্রাহ্য করে না।

ভাবিনী বলেন, করে নিক—বিয়ের পরে তো করতে আসবে না। সয়ে যাও বউ, খিচখিচ কোরো না।

ছুটা সমস্ত শুনেছে। বাঘিনীর ছাড়পত্র—আর তাকে পায় কে! চৌঠা মাঘের মাঝে যে ক'টা দিন আছে, জন্মের শোধ কুমারীত্ব করে নিচ্ছে। সে কী প্রচণ্ড ব্যাপার—যুগপৎ জলে স্থলে এবং গাছে চড়াও আছে যখন, অন্তরীক্ষে—মুলটির মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে যাচ্ছে। কেউ কিছু বলে না—ছুটা হেন মেয়ে ঘোমটার নিচে জবুথবু হয়ে থাকবে, নতুন অজানা সংসারে টিপে টিপে পা ফেলবে—সেই করুণ দৃশ্য মনে মনে কল্পনা করে ক্ষমাঘেন্না করে যায়।

বুড়ি-চ্ছু খেলে—সোমত্ত হয়ে গেছে কিনা, ছেলে-খেলুড়ে নেবার জো নই—সবগুলো মেয়ে। চু-উ-উ—দম ধরে দৌড়। ভ্রমরের একটানা গুঞ্জনের মতো। এক-পায়ে লাফানোর খেলা—লাফিয়ে লাফিয়ে অর্ধেক গ্রাম চক্কোর মেরে এল। কানামাছি খেলে—চোখ-বাঁধা অবস্থায় দু-হাত বাড়িয়ে এদিক-সেদিক খুঁজে খুঁজে ঘুরছে, হঠাৎ ছুটে গিয়ে একটার ঘাড়ে বিষম চাপড়। কলরব : ওরে বাবা

পিঠ ভেঙে দিয়েছে। দেখছে ঠিক—নয়তো নিরিখ করে চড় কষাল কেমন করে?

কাদা মাখে ইচ্ছাসুখে। ইটখোলার খানা—বর্ষায় জল জমে, পাট পচানি দেয়, পাট কাচে। পাট নিয়ে ঘরে তোলে, ধবধবে পাটকাঠি ডাঁই হয়ে পড়ে থাকে। সাদা পাহাড় যেন। তারই উপর দিয়ে ছুটা ছুটে বেড়ায়—ছটাক পরিমাণ দেহ বলেই পারে। পাটকাঠি মটমট করে ভাঙে। রূপকথায় যেমন আছে—রাজকন্যার হাড়-মটমটি ব্যারাম। ওঝা-বদ্যি কত আসে, ব্যাধি সারে না। এ-পাশ ও-পাশ করতে হাড়-পাঁজরাগুলো মটমট করে ওঠে। শেষকালে রাজপুত্তুর এলেন গুণীনের ছদ্মবেশে। তিনি চিকিৎসা করলেন। এবং ভিজিটের বাবদ গোটা কন্যাকেই নিয়ে গেলেন। কায়দাটা বুঝলেন না? চালাকি করে রাজকন্যা বিছানার নিচে পাটকাঠি রেখে দিয়েছিলেন।

লাফালাফি করে ছুটা পাটকাঠির উপরে। পাটকাঠি সরে যাচ্ছে, ভাঙছে। ইটখোলায় এখন জল বড় নেই, পচা কাদা—পা ঠেকালে হাঁটু অবধি ভুস করে তলিয়ে যায়। মাছ আছে নাকি সেই কাদার মধ্যে—পাড়া-বেপাড়ার ছেলেগুলো হাতড়া দিয়ে মাছ ধরছে। অর্থাৎ যত্রতত্র হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছে হাতে মাছ ঠেকবে সেই আশায়। মাছ কতটা কি পেয়েছে বলে না—কাদা মেখে সব ভূত। মুখের দিকে চেয়ে চেনা যায় না, কথা বলিয়ে তবে চিনতে হয়।

ছুটা ছাড়বে এমন মওকা!

যেখানে পাটকাঠি সব চেয়ে উঁচু, সেখানে উঠে হাত-পা'র বশ ছেড়ে দিল সে। মজা করে নেমে যাচ্ছে পাহাড় থেকে নিচে পড়বার মতন। ব্যালান্স রেখে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, তিলেক টলছে না। সড়াক করে কাদার মধ্যে। মাছ না-ই বা পেল, কাদায় গড়াগড়ি খাওয়া যাচ্ছে বেশ। কাদা কিছু তরল হলে ডুবও দিত বোধহয়। মাছ ধরার নামে আচ্ছা রকম নর্তন-কুর্দন করে কাদা মাখছে—এত সুখ কারো কারো সহ্য হয়নি, বাড়িতে খবর পৌঁছে দিয়েছে। ভাবিনী বাঘের মতন হামলা দিয়ে পড়ে হাত ধরে টানতে টানতে পুকুর-ঘাটে কাদা ধুতে বসিয়ে দিলেন।

কোন কোন দিন ভোর হতে না হতে পুকুরে গিয়েও পড়ে। মনের সুখে সাঁতার কাটছে। লাল শাপলা ফুটে একটা দিক আলো হয়ে আছে—শাপলা তুলে তুলে প্রত্যাশীদের জন্য পাড়ে দিয়ে আসছে। দল বেঁধে পাতিহাঁস ভাসছে—ছুটা তাড়া করেছে, পাল্লা দিয়ে সাঁতরাচ্ছে হাঁসের সঙ্গে। সেজঠাকরুনের শুঁচি-বাই—স্নান করে যতবার তিনি উঠতে যাচ্ছেন, জল দিচ্ছে তাঁর গায়ে। গালি-গালাজ করতে করতে ঠাকরুন আবার স্নানে নামেন। ডুব দিয়ে দিয়ে ছুটার চোখ লাল, আঙুলের চামড়া ঠরসে গেছে—ওঠার তবু নাম নেই।

পুকুরে বেগ মেটে না—দৌড়তে দৌড়তে গ্রাম-সীমানায় প্রাচীন দীঘির উঁচু পাড়ে উঠে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সেখান থেকে।

শুনতে পেয়ে রাধিকা গালিগালাজ করেন: গোঁজা-টোজা বিঁধে যাবে কোনদিন, টের পাবি হারামজাদি।

ছটার কানে নিতে বয়ে গেছে। জল ছিটায়, শেওলা ছোঁড়াছুঁড়ি করে সঙ্গিনীদের সঙ্গে। কচুরিপানার থোপা থোপা বেগুনি ফুল তুলে কোচড় ভরছে—

মণিলাল পাড় ধরে হন্তদন্ত হয়ে যাচ্ছে—ইস্কুলেই যাচ্ছে ঠিক। ফেল করার পর থেকে ছটা তার নতুন নাম দিয়েছে : ফেল-করা মাস্টার। আরও সংক্ষেপে ফেলু মাস্টার। মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি চাগিয়ে উঠল—টিপিটিপি ডাঙায় না উঠে পিছন দিক থেকে গায়ে কচুরিপানা ছুঁড়ে দিল। দিয়েই দৌড়। রাগে গরগর করতে করতে মণিলালও তাড়া করেছে। খানিকটা গিয়ে ছটার খেয়াল হলো, অভেদ্য কবজকুণ্ডল পরা রয়েছে তার—ঠেঙানি পাছের কথা, কান কি চুল ধরে টানা, এমন কি গায়ে আঙুল ঠেকানোর এক্তিয়ার নেই কারো—সে কি জন্য ছুটে মরছে? দাঁড়িয়ে পড়ল সে, দাঁড়িয়ে দাঁত মেলে হাসছে।

ধরবি নাকি ও ফেলু? ধর্ না, কত হিম্মৎ দেখি।

মণিলালও থমকে দাঁড়িয়েছে। মজাটা বেশ। সোমত্ত মেয়ে যা খুশি করে যাবে, পাল্টা কিছু করার জো নেই। বলল, পানা ছুঁড়ে কেন মারলি?

ছটার মন্তব্য : গোবর তো ছুঁড়িনি—

জনান্তিকে আবার বলছে, ইঞ্জিনিয়ারের বউ যখন হব, বি-এ ফেল দিয়ে বাসন মাজাব আমি।

মণিলাল গর্জে উঠল : আমিও শোধ নেবো দেখিস। লোকের সামনে মুখ তোলার উপায় রাখব না।

কেমন করে?

বলে দিলাম আর কি!

পাক দিয়ে ঘুরে মণিলাল হনহন করে চলল। মেয়েলোকের কৌতূহল উসকে দিলে রক্ষা নেই। সামলে থাকতে পারবে না—খোশামোদ করবে, হাতে-পায়ে ধরবে। হলো তাই, ছুটে এসে ছটা মণিলালের দু-হাত ধরল। সোমত্ত মেয়েকে ছুঁলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়, কিন্তু সোমত্ত মেয়ে নিজে ছুঁলে বোধহয় দোষ নেই। হাত ধরে আবদারের সুরে ছটা বলছে, বল্ না, কি করবি?

অনেক খোশামুদির পর মণিলাল বলল, মানুষটা তুই ছোঁয়ার বাইরে গেছিস, কিন্তু ছবিটা আমার হাতের মধ্যে সেটা ভুলিসনে। সকল শোধ ছবির উপর নিয়ে নেবো।

কোন ছবি?

উপহার দেবো যে ছবি। বিয়ের সময় ছাতনাতলায় বরযাত্রী কন্যাযাত্রী সকলের সামনে টাঙিয়ে দেবো।

মণিলাল ভাবিনীর কাছেও গিয়ে পড়ল : শিক্ষক বলে আমার একটা ইজ্জত আছে পিসিমা। এক সাবজেক্টে ফেল করেছি, তার জন্য যা-তা বলছে—নামই পালটে দিয়েছে আমার। দৈবাৎ একটা পেপার খারাপ হয়েছিল, সামনের বার

নির্ঘাৎ পাশ করে যাবো।

ছটার মৃদু মন্তব্য : কোন বারই না!

মণিলাল বলে, শুনলেন? নিজে যেন পি-এইচ-ডি পি-আর-এস. সমস্ত কবজা করে বসে আছে।

পিসি ছটাকে শাসন করেন : ঝগড়াঝাঁটি ফের? বিয়ে হয়ে যাচ্ছে না তোর?

ছটা মুখ করুণ করে বলে, হচ্ছেই তো! তাই কি মানবে? মানে না বলেই ঝগড়া।

এবার মণিলালের মন্তব্য : বিয়ের নামে কপালের উপর দুটো করে শিং গজায়। সত্যি না মিথ্যে হাত বুলিয়ে দেখা যেতে পারে।

ছটা বলে, শুনছ পিসিমা?

মণিলাল বলে, কারো নাম করে বলিনি পিসিমা। বিয়ে জগতের মধ্যে কেবল একটা মানুষেরই হবে না।

পিসি কড়া হয়ে হুকুম দিলেন : কথাবার্তা তোদের বন্ধ। সাদামাটা কথাও না। মণি ডাকলে জবাব দিবিনে ছটা, মুখ ফিরিয়ে চলে যাবি।

ঠোঁটে কুলুপ এঁটে দিলেন বাঘিনী-পিসি। যেটুকু রইল, সে হলো মুখ ভ্যাংচানো অথবা মুখ টিপে হাসা। কিন্তু মানুষটা যদি ছটার দিকে না তাকায়, সে অস্ত্রে কোন্ কাজ দেবে বলো!

৷৷ পনর ৷৷

নন্দনপুর দত্তবাড়ি। বাইরের দিককার ঘরটা মণিলালের—ঐখানে শোওয়া-বসা পড়াশুনো। ছবি আঁকার বাতিক আছে—স্টুডিও-ঘরও ঐ। ইস্কুলের অ্যানুয়েল-পরীক্ষা হয়ে গেছে, মেলা খাতা এসেছে, তাড়াতাড়ি দেখে দিতে হবে। সকাল থেকে মণিলাল ঐ কর্মে ছিল। হুঁশ হলো, এগারোটা বেজে গেছে তখন। ইস্কুলে ক্লাস বসে না আজকাল—যাকগে যাক, আজ কামাই। সন্ধ্যে পর্যন্ত খেটে খাতা দেখা শেষ করে ফেলি, আপদ চুকিয়ে দিই।

খাতা দেখছে সে একমনে। রান্নাঘরে ভাত দেওয়া হয়েছে, বোন দিবা এসে ডাকাডাকি করে তুলতে পারল না। দত্তগিন্নি তখন নিজে এসে পড়লেন।

ঘরের দরজায় তালা দিয়ে টেনে দেখে নিঃসংশয় হয়ে মণিলাল রান্নাঘরে চলল। খাতার ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক, যেহেতু ইস্কুলের ছেলেগুলোর সুশীল সুবোধ বলে খ্যাতি নেই। পরীক্ষায় বসে টোকাটুকি করা, পরীক্ষা হয়ে গেলে পরের অধ্যায়ে খাতা পাচার করা ইত্যাদি কর্মে সাতিশয় ওস্তাদ তারা। ও-বছর হেডপণ্ডিতের বাড়ি খাতা সরানোর ব্যাপার ঘটেছিল, এবং তৎসহ নিদ্রামগ্ন পণ্ডিতের তৈলচিক্কণ টিকিটিও। সব মাস্টার সেই থেকে সন্ত্রস্ত।

কিন্তু আজকের এই দিনদুপুরে—মণিলাল আর দিবা খেতে বসেছে, মা দেওয়া-থোওয়া করছেন—হুড়মুড় করে কি পড়ল রে বাইরের ঘরের ভিতর?

কে, কে ওখানে? দিবার খাওয়া সারা হয়েছে, সে ছুটল। দত্তগিন্নিও গেলেন।

কাচনির বেড়ার ফাঁকে আবছা মতন দেখতে পেয়ে দিবা 'চোর', 'চোর' বলে চেঁচাচ্ছে: ও দাদা, চোর ঢুকেছে তোমার ঘরে।

হাঁক পেড়ে মণিলালও এঁটো-হাতে উঠে পড়ল। দরজার তালা যেমন ছিল তেমনি আছে, চোর কোন কায়দায় ঢুকল তবে?

বাহাদুর চোর! বেড়ার মাথা ও চালের মধ্যে সামান্য ফাঁক, ইঁদুরটা বিড়ালটা হলে যেতে পারে। আর দেখা যাচ্ছে, ছটাও পারে। ইজেলে ছবি—একটু একটু করে অনেকদিন ধরে করছে। ঢুকেই ছটা প্রথমে ছবি দেখল। আহা, কী সুন্দর হচ্ছিল—ছটা এত রূপসী ঘুণাক্ষরে জানত না তো! মণি-লালের তুলি তাকে রূপ দিয়েছে, দিয়ে আবার হরণ করে নিচ্ছে। মিছামিছি তড়পায়নি সে—অপমানের শোধ তুলছে ছবির উপর দিয়ে, নিজের বানানো বলে এতটুকু মায়া হলো না। দুই গজদন্ত তুলে দিয়েছে ঠোঁটের দু-পাশ দিয়ে, একটা কান দৃশ্যমান—পেঁচ টেনে নেতিটা তার লম্বা করেছে। হচ্ছিল লক্ষ্মী-

ঠাকরুনটি, সেই বস্তু হিড়িম্বা রাক্ষসী বানিয়ে তুলেছে। আরও কি মাথায় আছে, কে জানে। ছটা তুলি হাতে নিল—একটা নয়, দু-হাতে দুটো। আক্রোশ ভরে ছবিতে রং লেপছে। রঙে সমস্ত ডুবে যাক। কিন্তু বিপদ ঘটল—অতিরিক্ত রাগে ও তাড়াতাড়িতে ইজেল উলটে পড়ল, জলের কুঁজোটা ভাঙল—

কে? কে ওখানে?

আসছে সব দুড়দাড় করে। পালাচ্ছে ছটা—যে পথে এসেছিল, সেই পথেই। লাফ দিয়ে তীরের বাঁশ ধরে আড়ায় উঠে পড়ল। বেড়ার উপর দিয়ে বাইরের দিকে পা বের করে দেবে—কি গতিকে তীর খুলে গিয়ে ধপাস করে পড়ে গেল মেঝেয়। অস্পষ্ট আর্তনাদ একটু—বিষম চোট খেয়েছে, অল্পস্বল্পে মুখ খোলার মেয়ে নয় বাঘিনী-ঠাকরুনের পেয়ারের ভাইঝি ছটাকিবালা।

হৈ-হৈ ব্যাপার। বাড়ির এরা আছেই, পাড়া ভেঙে এসে পড়ল।

দত্তবাড়িতে ছটা নিমখুন হয়ে পড়ে আছে, মুলটি অবধি খবর চলে গেছে। মধুসূদন বাড়িতে না—ভাবিনী নোনাখোলার মাঠ ভেঙে পাগল হয়ে চলে এলেন। রাধিকা সঙ্গে।

চোখ পাকালেন ভাবিনী মণিলালের দিকে। থতমত খেয়ে সে বলে, আমার কি দোষ পিসিমা? বেড়া টপকে ঘরের মধ্যে ঢুকে আমার ছবির কি দশা করেছে দেখুন!

পিসি গর্জে উঠলেন : মেয়েটার এই দশা—ছবির শোক এখন উথলে উঠল! বেশ করেছে, খাসা করেছে। আমি নিজে এবারে তোর ছারপোকার কাঁথায় আগুন ধরিয়ে যাব।

মণিলাল বলে, বাঃ রে, আমি কি করলাম? পালাতে গিয়ে নিজেই তো আড়া থেকে আছাড় খেয়ে পড়েছে।

মণিলালের উপর তাড়না ছটা কাতরানি থামিয়ে পরিতৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করছে। কর-কর করে সে বলে উঠল, না পিসিমা, পড়িনি আমি—ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে।

মণিলাল বলে, দিলে ঠিক হতো। কিন্তু হবে কি করে—সোমত্ত হয়ে বসে আছে, গায়ে হাত ঠেকানোর জোটি নেই। মুখের দুটো গালিগালাজ—তা কথাই পিসিমা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন। ঘরে চোর ঢুকেছে, হৈ-হৈ করে সব আসছি—ভয়ের চোটে দিশা করতে না পেরে মাটিতে পড়ল।

ছটা ভ্রূভঙ্গি করে উড়িয়ে দেয় : শোন কথা! ভয়ে নাকি পড়ে গেছি। ভয় পেতে দেখেছে কেউ কখনো? পড়েছি-ই বা কবে কোথায়?

সে সত্যি। রাধিকা মেয়ের পাশে বসে হাঁটুতে তেল মালিশ করছিলেন। সায় দিয়ে বললেন, ঘরে বাইরে এইটুকু বয়স থেকে দস্যিপনা করে বেড়ায়—পড়ে যাবার কথা কখনো শুনিনি। আজকেই প্রথম।

মণিলাল বলল, তখন ছিল ছটাক ওজনের একফোঁটা খুকিমানুষ, আর এখন তো দিনে দিনে হয়ে উঠছে এক ঐরাবত হাতী—

এবং কথার সঙ্গে দু-হাত বিস্তার করে ঐরাবতের যথোচিত আয়তন দেখিয়ে দিল।

পা চেপে ধরে ছটা আঃ উঃ—করছিল, পায়ের ব্যথা ভুলে হি-হি করে হেসে উঠল : হাতীতে বুঝি ঘরের আড়ায় চড়ে? গাছমুখ্যু একেবারে। ফেলুমাস্টার নাম কি এমনি এমনি?

লাগেনি বেশি, ঝগড়ার দাপটে মালুম পাওয়া যাচ্ছে। জনতার রায় মোটা-মুটি মণিলালের পক্ষে গেল। অকুস্থল যখন নন্দনপুর—মাঠ পার হয়ে ছটাই এসেছে, মণিলাল যায়নি ছটাদের বাড়ি—দোষ অতএব ছটারই। চালাঘরের আড়ার উপর থেকে মেজেয় পড়ে যাওয়া—ছটা হেন মেয়ের কাছে এটুকু ডাল-ভাতের শামিল। বাড়ি নিয়ে শুইয়ে রাখো, চুন-হলুদ ফেটিয়ে পায়ের ওখানটা দাওগে—রাত পোহালে মেয়ে দেখবে ড্যাংড্যাং করে লাফাচ্ছে।

কনুই ধরে রাধিকা দু-পা হাঁটাবার চেষ্টা করলেন—উঃ উঃ করে মেয়ে বসে পড়ল। কাজ নেই এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে এমনি অবস্থায় হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া। আপাতত সম্ভবও নয় সেটা।

কাহার-পাড়া থেকে পালকি আনানো হলো, দত্তগিন্নি পালকিতে পুরু করে তোষক পেতে দিলেন--মাঠের উঁচুনিচু পথে ওঠানামায় ব্যথা না লাগে। সন্তর্পণে ধরে পালকিতে তোলা হচ্ছে—ছটার নালিশ : দেখ দেখ পিসিমা, ফেলুমাস্টার ভ্যাংচাচ্ছে। আমি খোঁড়াচ্ছি তো সে-ও খুঁড়িয়ে হাঁটছে, ঐ দেখ।

মণিলাল ঘরে ঢুকে যাচ্ছে—তার খোঁড়ানো কেউ দেখতে পায়নি। সত্যিই খুঁড়িয়ে থাকে তো সামলে নিয়েছে ইতিমধ্যে।

বাঘিনী-পিসি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন : মানলাম, তুই কিছু করিসনি --ছটাকি আপনি পড়েছে। কিন্তু জখম হওয়া তো মিছে নয়—তাই নিয়ে ভ্যাংচাবি তুই? একটু মায়াদয়া থাকবে না?

আঘাত যত সামান্য বলে সকলে উড়িয়ে দিয়েছিল, তা কিন্তু নয়। গোড়ায় পাতামুঠোর চিকিৎসা চলল কিছুদিন, সেই সঙ্গে হোমওপ্যাথি আর্নিকা। ব্যথা টেনেছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সারে না—ছটা পা টেনে টেনে হাঁটে।

শীতকালের ব্যথা সহজে সারে না, সবাই বলছে। কিন্তু বড়দিন যে এসে যায়, পাত্রের জেঠা কাশীর অধ্যাপকমশায় এসে পাকা দেখবেন। চৌঠা মাঘও দেখতে দেখতে এসে পড়বে। বিয়ের কনে ওদিকে খোঁড়া হয়ে রইল।

মধুসূদন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, সদরের হাসপাতালে নিয়ে এক্স-রে করিয়ে আনলেন। হাড়-টাড় ভাঙেনি—ভিতরের কোন গোলমাল পাওয়া গেল না। ছটাও শতকণ্ঠে তাই বলে, বাবা ব্যস্তবাগীশ মানুষ, মিছামিছি উতলা হয়ে পড়ল। কিছু হয়নি, আমি জানি। ব্যথা-ট্যথা একদম গেছে, হাঁটতে গিয়ে শিরায় সামান্য টান পড়ে।

ডাক্তার অভয় দিলেন : চলতে ফিরতে ওটুকুও সেরে যাবে।

মধুসূদন সকাতরে বললেন, আমার যে শিরে-সংক্রান্তি। দু-চারদিনের মধ্যে যাতে সেরে যায়, তার কোন ব্যবস্থা করুন ডাক্তারবাবু।

আচ্ছা—বলে ডাক্তার গুচ্ছের ওষুধ দিলেন, এবং এ-বাবদে সে-বাবদে এক গাদা টাকা গুণে নিলেন।

পাত্রের জেঠা কাশীধাম থেকে পেঁছে গেছেন, চিঠি এল। বারোই পৌষ মুলটি আসবেন, স্টেশন থেকে সরাসরি পালকিতেই আসবেন তিনি। শরীর ভাল না, বেশিক্ষণ থাকবেন না—সন্ধ্যার আগে সেই পালকিতেই আবার ফেরত চলে যাবেন।

মধুসূদন গজর-গজর করছেন : শরীর ভাল না তো বিশ্রাম-টিশ্রাম নিন, কাজের দিন বরকর্তা হয়ে আসর জাঁকিয়ে বসবেন। এই ধাপধাড়া জায়গায় ও'র আবার আলাদা করে আসার কি গরজ? পাত্রের মা কনে দেখেছেন, পাত্র নিজে দেখেছে, তাদের সব পছন্দ হয়েছে। উনি কি ঘরগৃহস্থালী করবেন বউ নিয়ে?

ছটাকে বললেন, হাঁট দিকি মা, সজনেগাছ অবধি চলে যা। লাগছে?

মুখের বিকৃতি চেপে নিয়ে ছটা বলল, নাঃ—

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মধুসূদন তার পায়ের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। বলছেন, পা চেপে চেপে—হ্যাঁ, বেশ নরমশরম হয়ে—খাসা হচ্ছে।

কিছুক্ষণ এমনি মহলা দেবার পর খানিকটা প্রসন্ন হয়ে বললেন, সামান্য একটু টেনে টেনে হাঁটছিস। বুড়োমানুষ ওটুকু আর ধরতে পারবে না।

॥ ষোল ॥

কাশীর জেঠাবাবু এলেন। দলে আরও তিনজন—বিল ভেঙে সাঁকো পার হয়ে তাঁরা আড়াআড়ি চলে এসেছেন। মেজেয় ফরাস পেতে বসানো হয়েছে তাঁদের। সামনের ফুল-লতাপাতা-বোনা আসনে ছুটা বসেছে।

হায়রে, যেখানে বাঘের ভয় সেইখানে সন্ধ্যা। বুড়ো হলে কি হবে, জেঠা-বাবুটি রীতিমত প্রগতিবান। প্রবাসে পড়ে থাকার দরুন এমনি হয়েছেন।

বললেন, জবুথবু কেন আজকালকার মেয়ে? সেসব দিন চলে গেছে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেড়াবে। তোমাদের গ্রুপ-ফোটো বুঝি দেয়ালে? নামিয়ে আনো দিকি মা, সকলকে দেখি।

হাঁটার পরীক্ষা, বোঝা গেল। সেকাল হলে সোজাসুজি হাঁটতে বলত, এবং মাটি অবধি ঝুঁকে চলনের দোষত্রুটি দেখত। একালেও হুবহু তাই—কথাগুলো ঘুরিয়ে মিষ্টি করে বলেন শুধু।

ছুটা যে বুঝেও বুঝল না। রয়েসয়ে পা টিপে টিপে গজেন্দ্র-গতিতে হাঁটবার কথা—কতক্ষণ ধরে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে মধুসূদন রপ্ত করে দিয়েছেন—ন্যাং-ন্যাং করে সে ছুটল ফোটো পেড়ে আনতে। সাধারণ অবস্থার চেয়েও খোঁড়ানোটা অনেক বেশি। এবং বেশ দৃষ্টিকটু।

বৃদ্ধ চমক খেয়ে বললেন, হাঁটনা মা-লক্ষ্মীর এমনধারা কেন? একখানা পা ছোট নাকি?

ছোট হবে কেন? পা পিছলে পড়ে একটুখানি চোট লেগেছে।

জেঠাবাবু চুকচুক করেন: আহা-হা। তা ভাবনা করবেন না ঘোষমশাই। এদের বয়সে অমন কত চোট লাগে, সেরেও যায়।

গম্ভীর হলেন এর পর। তেমন-কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না, নিঃশব্দে চুরুট টানতে লাগলেন।

হাতঘড়ি দেখে হঠাৎ ধড়মড় করে উঠলেন: গাড়ি আটটায়। যেতে ঘণ্টাদেড়েক তো লাগবেই। উঠি।

পালকিতে উঠতে উঠতে মধুসূদনকে বললেন, ছুটির পরেও আমি থাকব। মা-লক্ষ্মী নির্দোষ হয়ে সারলে একখানা পোস্টকার্ড ছেড়ে দেবেন। আবার আসব।

লজ্জা-সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে মধুসূদন বিয়ের প্রসঙ্গ তুললেন: চৌঠা মাঘ তো এসে গেল—মাঝে আর বিশটে দিন। যোগাড়যন্তর সব করে ফেলেছি। কিন্তু অস্থিতপঞ্চক অবস্থার মধ্যে আত্মীয়কুটুম্ব কাউকে তো বলা যাচ্ছে না।

বৃদ্ধ উদাসকণ্ঠে বললেন, বিয়েথাওয়া এখন হচ্ছে কি করে? পা সারিয়ে

মেয়ে আগে খাড়া করে তুলুন, ওসব তারপরে।

বেহারারা পালকি কাঁধে তুলে এ-হে ও-হো ডাক ছেড়ে রওনা হয়ে পড়ল। ফাঁসল তবে ইঞ্জিনিয়ারিং-পড়া ছেলে। অপমানে মধুসূদনের মুখ কালিবর্ণ। এতদূর এগিয়ে এমন লোক-জানাজানি হবার পর সামান্য পায়ের ব্যথা বরবাদ করে দিল।

চুলোয় যাকগে। ভাল সম্বন্ধ আরো একটা হাতে আছে। ছেলেটি ডাক্তার, বছর দেড়েক পাশ করেছে—তৈরি মাল। সে হিসাবে ইঞ্জিনিয়ারিং-ছাত্রের চেয়ে অনেক ভাল। সংসারের কর্তা বড়ভাই ছটাকে দেখে পছন্দ করে গেছেন। কিন্তু ভীষণ খাঁই—নগদে গয়নায় হাজার পনেরোর মতন। হবে না কেন? পাশ করার পর ছেলে মাঝারি গোছের একটা চাকরিও জুটিয়ে নিয়েছে। পুরোপুরি তৈরি অতএব।

টাকার অঙ্ক শুনে মধুসূদন চেপে ছিলেন, কোনরকম উচ্চবাচ্য করেননি এতদিন। কিন্তু মানইজ্জতে ঘা পড়ে যাচ্ছে, টাকার হিসাব করতে গেলে হবে না। শুভকর্ম চৌঠা মাঘ হওয়া আর সম্ভব নয়। তবে তাড়াহুড়ো করে মাঘ মাসের ভিতরে যেভাবে হোক সমাধা করবেন।

চিঠিপত্র নয়, পাত্রের জ্যেষ্ঠের কাছে মধুসূদন নিজে গিয়ে পড়লেন : ভাই আপনার রত্নবিশেষ। দাবি যা করেছেন, তার উপর আমি একটি কথাও বলব না। আঁকেমুখে ভজিয়ে দেবো। কনে তো দেখাই আছে—পণের অর্ধেক আগাম নিয়ে লগ্নপত্র সেরে দিন। মাঘের আটাশে আর ঊনত্রিশে দুটোই বিয়ের তারিখ। যেদিন খুশি।

এমন ঢালাও কথাবার্তার উপরেও জ্যেষ্ঠ দেখি প্যাঁচ খেলছেন। বলেন, মেয়ে দেখেছি বটে, অপছন্দের মেয়ে নয় তা-ও মানি, ভাইকে তবু একবার দেখিয়ে নিতে চাই। চাকরিসূত্রে ভাই শিগগিরই জলপাইগুড়ি চলে যাচ্ছে, বাসা করে থাকবে। শেষকালে যদি কথা ওঠে, আমি তার দায়িত্ব নিতে চাইনে।

ডাক্তার পাত্র স্বয়ং পাত্রী দেখতে আসছে। যথারীতি ছটাকে আসন পেতে বসানো হয়েছে। দেয়ালের গ্রুপ-ফোটো সরিয়ে দিয়েছে। দেয়ালে কি ঘরের মধ্যে কোন কিছুই রাখেনি যে ফরমাস করবে, এটা আনো ওটা সরিয়ে দাও। পইপই করে ছটাকে সামলে দিয়েছেন, যা-ই বলুক আর যা-ই করুক, আসন ছেড়ে এক-পা নড়বিনে তুই। নড়বার কিছু হলে আমরাই তা করে দেবো। লজ্জা দেখিয়ে তুই জড়সড় হয়ে থাকবি।

ছটা ঘাড় নেড়ে মহোৎসাহে বলে, কুকুর-বেড়াল যেমন কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে-না, তেমনি হয়ে থাকব আমি।

মধুসূদন বলেন, না রে, তাহলে কুঁজো বলবে। সিধে হয়ে থাকবি, কিন্তু কাপড়-চোপড় জড়িয়ে জবড়জং হয়ে।

এটা বেশ ভাল করে বুঝে নিয়ে ছটা দ্বিতীয় দফায় বলছে, যত যা-ই বলুক, মোটেই আমি সাড়া দেবো না—অ্যাঁ বাবা?

তা হলে কালা বলবে। সাড়া দিবি, তবে জায়গা ছাড়বিনে। আমরাই সামলে-সুমলে নেবো।

এমনি অনেকরকম শিখানো-পড়ানো আছে। পাত্র এল দুই বন্ধু সহ। ছটাকে ঘরে বসিয়ে রেখেছে—কিন্তু ঘরেই ঢুকল না তারা। বলে, রোদ্দুরটা বেশ লাগছে। রোয়াকের উপরে বসি আমরা, কনেও এইখানটা চলে আসুন।

হলো তো? কি করবেন, করুন এইবার। হাঁটানো ছাড়া রোয়াক অবধি পালকিবেহারা করে আনা চলে না। কনের পায়ের সম্বন্ধে কিছু-না কিছু শুনে থাকবে—মতলব পাকিয়ে এসেছে। দুই বন্ধু, দেখ না, দুদিক দিয়ে তীক্ষ্ণচোখে ছটার পা ফেলার দিকে তাকিয়ে—পদযুগল ছাড়া অন্য কিছু দ্রষ্টব্য নেই যেন। হবু-ইঞ্জিনিয়ার ফেঁসেছে—এবং এই পুরো-ডাক্তারটিও নিঃসন্দেহে ফাঁসবে।

সম্বন্ধ টেকে না—বিপদ হলো দেখছি। পায়ের ত্রুটির কথা চাউর হচ্ছে, বিয়ে দেওয়া কঠিন হয়ে উঠছে দিনকে-দিন। যত দেরি হবে, হিতৈষীজনের অভাব নেই—ব্যাপারটা ডালপালা সহযোগে বেশি করে ছড়াবে। মধুসূদন ক্ষেপে উঠলেন—দিনরাত্রি মেয়ের বিয়ের চিন্তা।

সেই গোড়ার আমলে ঘটক একটা খবর এনেছিল, পাত্র দোজবরে এবং মুনসেফ। সবিশেষ শুনে মধুসূদন তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দেন। ছেলেপুলে হবার আগেই প্রথম পক্ষ গত হয়েছে, সেটা মন্দের ভালো। তবু মনে খুঁত-খুঁতানি থেকে যায়, টোপর এর আগে একবার চড়িয়েছিল তো মাথায়। বাজারের পুরোনো ফার্নিচার কেনার শামিল—ব্যবহারে গা ঘিনঘিন করে। পুরানো হাত-ফেরতা মাল চলবে না তাঁর ছটার ব্যাপারে।

কিন্তু অধিকতর আপত্তি হয়েছিল চাকরির কারণে। হাকিম বলে খাতির-সম্মান যত বড়ই হোক, মাসান্তে শুখো মাইনে—সরকার বাহাদুর গোণাগুণতি যা দেন, তার উপরে আধেলাপয়সা উপরি নেই। ভূতপূর্ব ফরেস্টার মধুসূদন ঘোষ উপরি রোজগারের নিরিখে মানুষের মূল্য বিচার করেন। সে হিসাবে জামাই হবার পক্ষে মুনসেফের চেয়ে মুনসেফের পেশকারের দাবি অধিক জোরালো। মাইনে ও মানইজ্জত যত সামান্যই হোক, রোজগার দিয়ে পেশকার বাবু খোদ মুনসেফকেই কিনে ফেলতে পারেন।

দায়ে পড়ে সেই ঘটকের কাছে মধুসূদন নিজে চলে গেলেন: হাকিম পাত্তোরটা কোথাও গেঁথে গেল কিনা খবর নাও। থাকে তো তাদের নিয়ে এসো, মেয়ে দেখুক। হাকিম তো হাকিমই সই। দোজবরে—তা আর কী করা যায়।

না, গাঁথেনি—আছে ছুটো এখনতক। টোপ ফেলছে অনেক জনা, গেলেনি কোন টোপ। হাকিমের বাপ মেয়ে দেখতে এলেন। দুটো-পাঁচটা আজেবাজে

জিজ্ঞাসার পর সোজাসুজি ফরমাশ : খানিকটা হাঁটো দিকি মা, ঐ দেয়াল অবধি চলে যাও।

মধুসূদন মেজাজ হারালেন। হবেই না তো কিসের পরোয়া? বললেন, রূপ-গুণ কোন-কিছু কাজে লাগে না, শুধুই হাঁটনা। বলি, বউ নিয়ে কি রেসে পাঠাবেন মশাই?

ভদ্রলোক বললেন, অঙ্গগুলো তো নিখুঁত আবশ্যক।

অঙ্গ তো একটা মাত্র নয়। নাক-চোখ-মুখ তাকিয়েও দেখলেন না, সকলের আগে পায়ের খবর। পায়ের উপর এত রোখ কেন বলুন তো?

বলুন তো কেন?

ভদ্রলোক টেনে টেনে হাসতে লাগলেন। বলেন, ঘোষমশায়, আপনি ভাগ্যবান লোক। কতদিকে কত সুহৃৎ, লেখাজোখা নেই। উড়োচিঠি চলে গেল : খুঁতো মেয়ে—খোঁড়া পা। ভাল করে হাঁটিয়ে দেখে নেবেন।

দোজবরে হাকিম পাত্র—সেখানেও এই। এর পরে আরও দু-তিন জায়গা থেকে এসেছিল—অবস্থার ইতরবিশেষ নেই। মোটের উপর এটা পরিষ্কার, এই মুলটি অঞ্চলে যতদিন আছেন মেয়ে দেখিয়ে বিন্দুমাত্র লাভ নেই। মেয়ের পা টেনে হাঁটাই সার—হাঁটার হিসাবে নিখিল-ভারত পরিক্রমা সারা হয়ে গেলেও পাত্র গাঁথবে না। পৈতৃক ভিটা ছেড়ে সবসুদ্ধ যদি দূর-দূরান্তরে আস্তানা গাড়েন, তবে কিছু সুরাহা হতে পারে।

শীতকালে এখন কাদাজল শুকিয়েছে, পশ্চিমপাড়ায় সাতকড়ির বাড়ি যাবার অসুবিধে নেই। দুপুরে মণিলাল ঘোষবাড়ি আর আসে না, মামার-বাড়িতে খায়। ধরতে হবে তাকে—বাড়ির সামনের পথে মধুসূদন নজর রেখেছেন। পুরো হপ্তা গেল, মণিলালের পাত্তা মেলে না। বোঝা যাচ্ছে, সোজা রাস্তা এড়িয়ে বাগান-আগান ভেঙে যায় সে। পাপ-মনে ভয় ঢুকেছে।

টিফিনের সময়ের আন্দাজে একদিন মধুসূদন সাতকড়ির বাড়ি চলে গেলেন। পাঁচিল-ঘেরা বাড়ি, পাঁচিলের দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়েন : কোথায় রে মণি? বাইরে আয়।

মণিলাল ইস্কুল থেকে সবে এসে দাঁড়িয়েছে, খেতে বসবে এখন। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। মধুসূদনের দিকে চাওয়া যায় না, মুখের উপর অগ্নিকাণ্ড। মণিলাল বলল, এখানে কেন, ভিতরে এসে বসুন মেসোমশায়।

আপ্যায়ন মধুসূদন কানেও নিলেন না। ফেটে পড়লেন : নেমকহারাম—যেমন মামা তেমনি ভাগনে। যে পাতে খাস, খাওয়া অন্তে সেই পাতেই ইয়ে করিস তোরা।

ক্লাসে বকে বকে মণিলালের মুখ তিতো হয়ে গেছে। ঘরে এসে একটু জিরোতে না জিরোতে উৎকট চেঁচামেচি। কিছু গরম সুরেই সে বলল, খালি

গালিগালাজই করছেন—কি হয়েছে, বলবেন তো সেটা?

ন্যাকা সাজছে। জানিসনে কি হয়েছে?

না। কিছু বলবার থাকে তো বলুন। কথা কাটাকাটির সময় নেই—দুটো মুখে দিয়ে এক্ষুনি আবার ইস্কুলে ছুটতে হবে।

শত্রুতা সাধছিস তুই, যে সম্বন্ধটা আসে উড়োচিঠি দিয়ে ভাংচি দিস।

না—

দৃঢ়কণ্ঠে মণিলাল বলে, আমি নই। কেউ কিছু করলে তার জন্য আমায় কেন দুষবেন?

বুঝিনে আমরা কিছু—ঘাস খাই, উঁ? হারামজাদা বেইমান কুকুর—

গালাগালির স্রোত চলল। মণিলাল দড়াম করে মুখের উপর পাঁচিলের দরজা এঁটে দিল।

মধুসূদন থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এতদূর আস্পর্ধা!

॥ সতর ॥

রাগের মাথায় কাজটা করে ফেলে মণিলালের মহাআতঙ্ক।

মামী—সাতকড়ির বউ, ওদিকে হাঁকাহাঁকি লাগিয়েছেন : চোখ-রাঙানির কি ধার ধারি, চালে চাল দিয়ে বসত করি আমরা? মেজাজ দেখাতে এসেছেন! পরের বাড়ি চোরাই কর্ম করতে গিয়ে মেয়ের ঠ্যাং ভেঙেছে—খোঁড়া মেয়ে কে নিতে যাবে, মেয়ের তো মন্বন্তর হয়নি। বেশ করেছিস তুই, উচিত মতো জবাব দিয়েছিস। খেতে বোস এবারে, ভাত ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

খাওয়া আর আসছে না, দু-এক গ্রাস মুখে দিয়ে মণিলাল উঠে পড়ল। রাগের বশে ঘোর অন্যায় করে বসল—মধুসূদনেই শেষ নয়, বড়-সেনাপতি বাঘিনী পিসি এসে পড়বেন। দরজা বন্ধ করে সেখানে পার পাওয়া যাবে না। এসে পড়লেন বলে। পিসি রাগলে প্রলয়ঙ্কর কান্ড। এ বাড়ি না পেলে ইস্কুল অবধি হানা দেবেন, ধুন্দুমার লাগাবেন শিক্ষক-ছাত্র সকলের মাঝখানে। কেলেঙ্কারির চরম। চুলোয় যাক ইস্কুল—মুলটি গ্রামের ত্রিসীমানায় থাকবে না রাগ ওঁদের খানিকটা উপশম না হওয়া পর্যন্ত।

আধখাওয়া সেরে হনহন করে নোনাখোলার মাঠ ভেঙে মণিলাল নন্দনপুর নিজের বাড়ি গিয়ে উঠল। এখানে জোর কত! মা আছে বোন আছে, আর হাঁক পাড়লে পড়শিরা রে-রে—করে বেরিয়ে পড়বে। ছটা এসে আচ্ছা রকম টের পেয়ে গেছে। সে মামলায় মণিলালের জিত—ষোলআনার উপর আঠারোআনা। মেয়েটার জন্মের শোধ একটা পা গেল, তার উপরে নিন্দে-মন্দ যত-কিছু কুড়াল সে-ই।

বাড়ির উঠানে সে অস্থিরভাবে চক্কোর মারে, আর ঘন ঘন মাঠের দিকে তাকায়।

আশঙ্কা অমূলক নয়—ভাবিনীকে দেখা গেল অনতিপরেই। একলা তিনি। মধুসূদন নেই কেউ নেই—বাঘিনী-পিসির মানুষ লাগে না, একাই তিনি এক সহস্র—মাঠের ডেলাবন ভেঙে একা একা তিনি ঝড়ের বেগে আসছেন। রক্ষে নেই আর। বুক ঢিব-ঢিব করছে, দুর্গা-নাম জপছে মণিলাল মনে মনে।

কাছাকাছি হতেই 'আসুন' 'আসুন' করে সে রাস্তা অবধি ছুটে গেল। দাঁড়িয়ে পড়ে বাঘিনী চোখ পাকালেন : বড্ড যে খাতির! আর মধুকে বাড়ি ঢুকতে দিসনি তুই?

মণিলাল আকাশ থেকে পড়ে : কী সর্বনাশ, তা কেন হবে?

বল্ তবে কি হয়েছে!

আমার নামে মিথ্যে কলঙ্ক। ছটার বিয়ের সম্বন্ধ আসে, আমি নাকি উড়ো চিঠি পাঠিয়ে ভণ্ডুল করে দিই। মাস্টার-মানুষ আমি—ছটা ছাত্রী। কী লজ্জার কথা বলুন তো পিসিমা!

ভাবিনী ভ্রূকুটি করে বললেন, তুই লিখিসনি, তবে কে লিখতে গেছে?

মণিলাল সক্ষোভে বলে, তল্লাটের মধ্যে সকলে গোমুখ্যু, একা আমিই কেবল লিখতে পড়তে জানি। বলি, মেয়েকেও তো পড়তে লিখতে শিখিয়েছেন। ক'টা দিন বাদায় বেড়াতে গিয়েছিলাম, মেসোমশায় সেখানেও ছাড়েননি—মেয়ে পড়ানোর কাজে আমায় জুতে দিলেন।

বলতে চাস, ছটাকি নিজের নামে লেখে?

তা লিখবে কেন! নিজেদের মেয়ে ধোয়া-তুলসিপাতা, ভাজা-মাছখানা উল্টে খেতে জানে না। আমি পরের বাড়ির উড়ো আপদ—

বলতে বলতে গলা বুজে আসে, বাকি কথাগুলো ধাক্কা দিয়ে যেন বের করে দিল : যত দোষ নন্দ ঘোষ! পরের বাড়ির ছেলে বলে আমার উপরেই যত তম্বি। মেসোমশাই মামার-বাড়ি গিয়ে যাচ্ছেতাই করে বললেন। মুলটি ছেড়ে বাড়ি এসে পালালাম তো আপনি এই অবধি তেড়ে এসেছেন।

ইতিমধ্যে দত্তগিন্নি এসেছেন, দিবা এসেছে। এ-বাড়ির ও-বাড়ির জনা কয়েক এসেও জুটেছে। চোখের অগ্নিবর্ষণ করলেন বাঘিনী—পড়শিরা ছিটকে গিয়ে পড়ল। দত্তগিন্নির হাত ধরে টেনে বললেন, চলো মণির মা, ঘরে গিয়ে বসিগে।

দু-পা গিয়েই বলে ফেললেন, দিক গে ভাংচি যার যেমন খুশি। মেয়েটা তোমাকেই নিতে হবে মণির মা।

হঠাৎ-প্রস্তাবে দত্তগিন্নি দিশা করতে পারেন না। বললেন, ছটার বিয়ে মণির সঙ্গে?

আদা-জল খেয়ে চিঠি ছাড়ছে—উপায় কি বলো?

বলতে বলতে ফোঁস করে বৃদ্ধা নিশ্বাস ছাড়লেন। বলেন, মধুর মোটা আশা ছিল রাজা-উজির জামাই করবে, বউ নিয়ে তারা রাজঅট্টালিকায় তুলবে। তার জন্যে গয়নায় বরসজ্জায় নগদে দিতো-থুতোও বিস্তর। কপালে না থাকলে হয় না, বুঝলে? হতে করতে তোমার ফেল-করা ছেলে, আর এই খোড়ো-ঘরবাড়ি।

থেমে একটু দম নিয়ে জোরগলায় বললেন, পাত্তোর নিরেস বলে পাওনাটা তা বলে কম হতে দিচ্ছিনে। আসলে তো ছটারই পাওনা—সে ফাঁকিতে পড়বে, আমি থাকতে সেটা হবে না। যা যা দেবে মনন করেছিল, কড়ায় গণ্ডায় সমস্ত আদায় করে নেবো। বনকরে গিয়ে মধু কত বড় ফেরেব্বাজ হয়েছে, দেখে নেবো—হ্যাঁ।

বলে মাঠ-পারে মুলটি গাঁয়ের অলক্ষ্য মধুসূদনের উদ্দেশে কটমট করে তাকালেন।

ভাবিনীকে দাওয়ায় নিয়ে বসিয়েছে। দিবা সামনাসামনি বসে হামানদিস্তা নিয়ে পান সেঁচছে তাঁর জন্য। বুড়ির কথাবার্তার ধরন দিবার মোটেই ভাল লাগেনি। ভালমানুষের ঢঙে সে বলল, ছটা সেই যে টেনে টেনে হাঁটত, এখন কেমন পিসিমা?

ভাবিনী প্রাঞ্জল করে দিলেন: টেনে হাঁটা কিসের, খোঁড়াই তো। দুনিয়া-সুদ্ধ জানে, তুই জানিসনে? না, জেনেশুনে ন্যাকামি করছিস?

এক ঝলক অগ্নিবর্ষণ করেন মেয়েটার উপর। বলেন, অন্যেরা যা বলুক, খোঁড়ার খোঁটা তোরা কোন্ আক্কেলে দিবি? ভাল মেয়ে এই বাড়ি এসে খোঁড়া হয়ে ফিরে গেল। কী করেছিলি, তোরাই জানিস—টাকার বৃষ্টি করেও খোঁড়া নাম ঘোচানো গেল না। নইলে ছটা এ বাড়ির বউ—সাতজন্ম তোরা যদি তপস্যা করতিস তবু তো এমন হবার কথা নয়।

বোনকে ধমক দিয়ে মণিলাল গোলমেলে কথা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে ফেলতে চায়। বলে, কানে নিও না পিসিমা, দিবাটা বড্ড বাজে বাজে বকে। জানতে চাইছে, পায়ের দোষটুকু সম্পূর্ণ সেরেসুরে গেছে কিনা। মানে, খেলুড়ে ছিল তো ওরা—কুমির-কুমির কানামাছি চোর-পুলিশ কত খেলেছে। এক বাড়িতে হলে সেইটে আবার মজা করে চালাতে পারে—এই আর কি!

দত্তগিন্নিরও দোনামনা ভাব: কম হোক বেশি হোক বাড়ির বউটা খুঁতো হয়ে যাচ্ছে তো। আত্মীয়-কুটুম্ব নানান জনে নানা কথা বলবে। দাদাকে চিঠি লিখে দিই, তিনিই বা কি বলেন—

মণিলাল উৎসাহভরে বলে, লিখবেই তো মা। তিনি বরকর্তা। সরকারি কাজের ছুটিছাটা আগে থাকতে নিতে হয়। মামা কী যে খুশি হবেন। ছটাকে মা-মা—করে অজ্ঞান, বাদাবনে দেখতে পেতাম।

সুর বদল করে আবার বলে, আত্মীয়-কুটুম্বরা বলবে না কেন, বউ নিয়ে তাদের তো ঘর করতে হবে না। ভাবো দিকি মা, ছটার পা দু'খানা নিখুঁত থাকলে রক্ষে ছিল! ভাত চাপিয়ে দিয়ে হয়তো বা একছুটে চলে গেল মুলটি ঘোষবাড়ি—মায়ের কাছে। ভাত এদিকে পুড়ে কয়লা—

ভাবিনী পিসি আরও নির্ভয় করেন: হুঁ, যাচ্ছে মুলটি! সাদা জমিতেই হাঁটতে পারে না, মাঠের ডেলাবন ভাঙবে সেই মানুষ! আমারই ভাল পা দেখ্ কুঠেরোগীর মতন হয়ে গেছে।

মণিলাল জুড়ে দেয়: পা সেরেসুরে আবার যে সেই আগের মতন হবে—হাসপাতালের বিলেত-ফেরত ডাক্তার অবধি দেখেছে, তাই না পিসিমা?

ভাবিনী প্রবল ঘাড় নাড়লেন: ভাল হবার হলে এদ্দিন কি পড়ে থাকত এমনি? না, তোর সঙ্গে বিয়ের কথা উঠত? তুই ভাবিসনে বাবা। ছটার পা যেমন আছে, তেমনি থাকবে। চিরকাল।

রাত দুপুরে লগন। বাসরের রীতকর্ম সারা হলো, রাত পোহাতে তখন সামান্য বাকি। মণিলাল বেচারি ঝিম হয়ে পড়েছে। বাঘিনী-পিসি বউ-মেয়েদের তাড়া করছেন ; বাড়ি যা তোরা সব। এদের একটু ঘুমুতে দে, নয়তো মারা পড়বে। এখন যা, সকালবেলা এসে বাসিবিয়ে-টিয়ে দিবি।

উৎসব-ক্লান্ত বাড়ি নিশুতি হয়ে গেল। ছটা বাইরে গিয়ে এদিক-সেদিক উঁকিঝুঁকি দিয়ে এল। না, কেউ নেই। দুয়োর দিচ্ছে।

মণিলাল চোখ বুজে ছিল, কত ঘুম ঘুমোচ্ছে যেন। যেই না দরজা দেওয়া, খাট থেকে সড়াক করে নেমে পড়ল। খোঁড়ানোর ভঙ্গি করে, আর নিচু গলায় ছড়া কাটে : খোঁড়া ন্যাং-ন্যাং-ন্যাং—

বাসরে নববধূর সঙ্গে প্রথম কথা।

ছটার মুখে কুলুঙ্গির প্রদীপের আলো পড়েছে, হাসিতে সে মুখ ঝিকমিক করছে। চাপা গলায় বলল, কেমন খোঁড়া দেখতে চাস? দেবো জোড়পায়ের লাথি, ছিটকে গিয়ে পড়বি।

বধূর পালটা পতি-সম্ভাষণ।

বিয়ে হয়ে গিয়ে মণিলাল এখন কায়দায় পেয়েছে। সেটা শুনিয়ে দেয় : হ্যাঁরে, এটা কি বললি, পতি হয়ে গেছি না আমি?

জিভ কাটল ছটা : সত্যিই তো! দাঁড়াও। মনে ছিল না আমার—আনকোরা নতুন কিনা। দাঁড়াতে বললাম না চুপচাপ?

আরে আরে, হুকুম ঝাড়ে যে লাটসাহেবের মতন। কড়া সুরে মণিলাল বলে, কেন দাঁড়াব?

ততোধিক কড়া হয়ে ছটা বলে, গড় করব, পায়ের ধুলো নিয়ে মুখে মাথায় দেবো। পাপ করলাম, তার বিধান না হলে নরকে ডুবে মরব যে।

মরতে হয় মরবি, আমার কি! 'পতি পরম গুরু' চিরুনিতে আয়নায় কাপড়ের পাড়ে পর্যন্ত। আর জলজ্যান্ত সেই পতিকে জোড়াপায়ের লাথি! পা আমি কিছুতে ছুঁতে দেবো না, কেমন করে ধুলো নিস দেখি।

বলতে বলতে মণিলাল দরজার দিকে যাচ্ছে। পালাবে নাকি দরজা খুলে?

আর ছটা দেরি করে! দৌড়ে গিয়ে দু-পা জড়িয়ে ধরল। হা-ডু-ডু খেলার মতন। পড়ে যেতো মণি আর একটু হলে।

মাথা তুলে বিজয়িনীর মতন ছটা বলল, কেমন, পা যে ছুঁতে দেবে না?

যুগল-পা কষে এঁটে ধরে, কেউটেসাপে যেমন ছোবলের পর ছোবল মারে, ছটা ঢপ ঢপ করে পায়ের উপর মাথা ঠুকছে। ঠুকছে তো ঠুকছেই—ছাড়ে না। বাহাদুরি নিচ্ছে মাঝে মাঝে উপর দিকে মাথা তুলে : গড় করতে দেবে না যে? কেমন? কেমন?

কিন্তু মণিলাল দেখছে অন্য এক জিনিস। দেখে পাথর হয়ে গেছে। বলে, তুই দৌড়ে এলি—পা যে ভাল হয়ে গেছে। একটুও তো খোঁড়ার লক্ষণ নেই।

সেরে গেল হঠাৎ—

কেমন করে, কবে থেকে? এ বড় তাজ্জব।

ছুটা বলে, মায়ের এক ছেলে তুমি। খুঁতো-বউ বলে তোমার মায়ের খুঁত-খুঁতানি ছিল, মা-কালী তাই সেরে দিলেন। তা ভালই তো—

হেসে গলে গলে পড়ছে সে। বলে, মুখ গোমড়া করছ কেন গো? খোঁড়া বউ রাত না পোয়াতে নিখুঁত বউ হয়ে গেল। লাভই তো তোমাদের।

মণিলাল বলে, লাভে কাজ নেই। নিখুঁত বউ দু-দুখানা ভাল পা নিয়ে ক'মিনিটই বা ঘরে থাকবে! সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ছিল ভাল।

আবার বলে, ঘোর চক্রান্ত, এখন বুঝলাম। খোঁড়া দেখেই আমি সাহস করে ছাতনাতলায় নেমেছিলাম।

দুঃখের ভান করে কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছুটা বলে, সাত পাক সারা হয়ে গেছে, কী আর করবে এখন বলো!

পৌরুষ গর্জে উঠল মণিলালের: একটু যদি বেয়াড়াপনা দেখেছি, যেদিকে দু-চক্ষু যায় বেরিয়ে পড়ব। ত্রিভুবন খুঁজে পাত্তা পাবে না। স্পষ্টকথা আমার—হাঁ।

নতুন বউ সঙ্গে সঙ্গে বলে, ইট মেরে তবে খোঁড়া করে রাখবো। একখানা পা অন্তত। সত্যি সত্যি খোঁড়া। আমিই তখন ছড়া কাটব: খোঁড়া ন্যাং-ন্যাং-ন্যাং, কার দুয়োরে গিয়েছিলি—

বলতে বলতে থেমে গেল। হুঁশ হলো, পতিকে উপযুক্ত ভক্তিশ্রদ্ধা দেখানো হচ্ছে না। নিজের গাল দু-হাতে চড়ায়: ছি-ছি, অকথা-কুকথা মুখে এসে গেল। অভ্যাসদোষ। ইহকাল-পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেল আমার। যাচ্ছ কোথা, দাঁড়াও—

দাঁড় করিয়ে আবার এক চোট প্রণাম!

॥ শেষ ॥